(উপন্যাস)

"বিয়ের-বাঁধন" প্রণেতা

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এস্-সি

মেট্‌কাফ প্রেস্

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাত

সন ১৩৩০ সাল।

এক টাকা

Printed and Published by
SHASHI BHUSON PAL.
79 Balaram De St, Calcutta.

প্রাপ্তিস্থান।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বরেন্দ্র লাইব্রেরি
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজলক্ষ্মী লাইব্রেরি—
৬৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেট্কাফ্ প্রেস হইতে প্রকাশিত
পুস্তকগুলি অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়েও
পাওয়া যায়।

উৎসর্গ

—✻∷✻—

যা'র উৎসাহে ও আগ্রহে এই বইখানি এত শীঘ্র লেখা শেষ হ'ল সেই প্রিয়তমার করকমলে দেবার আনন্দ ছাড়তে পারলেম না।

মুনীন্দ্র

স্মৃতি পূজা

ক্ষিতীশের ঘুম ভেঙে গেল; ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়েছিল মনে করতে পারল না—বাইরের দিকে চাইতেই বুঝতে পারল তখনও যথেষ্ট রাত রয়েছে। সবাই নিশীথ রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্চে আর তার বোধ হয় বাকি রাত টুকু ভেবে ভেবেই কাটাতে হবে—মনে পড়তেই তার প্রাণটা ছটফট ক'রে উঠল; আরও একবার ঘোমবার চেষ্টা ক'রতে শুয়ে পড়ল।

ঘুম এলো না; মনের পর বিশ্রী রাগ হ'ল। উঠে আলো জ্বাল্তেই দেখ্‌ল পাশে শুভা শুয়ে আছে—খুব জড় সড় হ'য়ে ভয়ে ভয়ে একপাশে শুয়ে আছে—নববিবাহিতা বালিকা মায়ের তাড়নায় রাত কাটাতে এসেছে।

বালিকার ঘুমের ঘোরে তখন মুখ খোলা ছিল। দিনের বেলায় যে কাল মুখ সব সময়ে সে সযত্নে ঢেকে রাখে, আজ ঘুমের ঘোরে সেই অনাদরে ব্যথিতার খোলা মুখের পর হঠাৎ ক্ষিতীশের দৃষ্টি পড়ল। বিষম বিরক্তিতে ক্ষিতীশ শুভাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিবার জন্য ঘুম ভাঙাতে গেল—পারলনা।

নিজেই তবে বারান্দায় গিয়ে পায়চারি ক'রে বাকি রাতটুকু

কাটিয়ে দেবো' মনে করে দরজা খুলতেই শব্দ হ'ল। শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি শুভা উঠে পড়েই লজ্জায় মরে গেল—কাপড় চোপড় ঠিক ক'রে একপাশে জড়সড় হ'য়ে বসল।

*　　*　　*　　*

বিয়ের পর এ বাড়ীতে মহাসমারোহে এলেও, শুভার বুঝ্‌তে বেশী দিন লাগল না যে, দাদার মান মর্য্যাদাই ঠিক থাকল—কালো মেয়ের বে'হ'ল কিন্তু তার রূপ ত ঢাকা পড়ল না। যারপর দাদা, বোনের যথাসর্ব্বস্ব নির্ভর করলেন, কৈ ; তিনি ত মার্জ্জনা ক'র্‌তে পার্‌লেন না।

শুভা সামনে গেলে ক্ষিতীশের মুখের ভাবে তা'র অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত—নূতন আত্মসমর্পণ স্পন্দনে তা'র বুক ভরপুর। বড় লোকের বড়বাড়ীতে আয়নায় নিজের রূপ সব সময় দেখে কখনও ভুল্‌তে পা'ত না—অমন সুন্দর পুরুষের পাশে এ রূপ মোটেই মানায় না ! স্বামীর মুখের ভাব সে নীরবে সহ্য ক'রত ; এ বুঝি তার ন্যায্য প্রাপ্য—অমন সুন্দর স্বামীকে কি দিয়েছে সে ! কি নিয়েই বা সে কাছে যেয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কোথায় পালাবে—স্বামী চিনবার মত বয়স তার হয়েছে ; বয়স্থা মেয়ে সুন্দর যুবাকে তার যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রেই বাড়ীতে ঢুকেছে।

কালো হ'লেও তার মুখশ্রী দেখবার মত ছিল, তার মত রূপসী ধনীর মেয়ের অভিমান অহঙ্কার থাকে কিন্তু সে উপাদানে সে নিজেকে গড়তে সুবিধা পায়নি ; খাঁটী হিন্দু পরিবারে সে পালিতা।

বড় বাড়ীতে স্বামীকে দেখা না দিয়ে থাকাই তার সঙ্কল্প হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু মার জন্যে পারত না—মা সব সময়ে কোন না কোন কাজে তাকে ক্ষিতীশ বাবুর সামনে যেতে আদেশ ক'রতেন। শুভাও মার অবাধ্য হ'তে পারত না—তিনি যে গুরুজনেরও গুরুজন।

* * * *

ক্ষিতীশ বাবুও শুভার সাহচর্য্য সইতে না পেরে' বিরক্তিতে মন কানায় কানায় ভরে নিলেন। আজ বিকালে মাকে বলেই যেন কতকটা আশ্বস্ত হ'লেন; "মা ওকে দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও না।"

হেসে মা উত্তর করলেন,—"ঘরের বৌ বাপের বাড়ী পাঠাব কিরে? ও কি কথা? তোরা বাইরে থাকিস কিন্তু আমার যে ঐ এক অবলম্বন।"

—বলেই কিন্তু ছেলে কিছুতেই এমন লক্ষ্মী বউকে ভালবাসতে পারছে না—মনে পড়ল আর তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল।

ক্ষিতীশ কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চুপ ক'রে গেল—মা'র মুখ অন্ধকার।

"আচ্ছা মা তুমি যা' ভাল বোঝ তাই কর—রাগ কর না," বলেই ক্ষিতীশ বাবু বেরিয়ে গেলেন। মা ভাবলেন 'মেঘ বুঝি কেটে যাচ্ছে'।

তিন দিন আগে এক সন্ন্যাসী তাকে 'স্বামী বশ করবার

মাদুলি' দিয়ে নগদ পঁচিশ টাকা আদায় ক'রে নিয়ে গেছে। মা যখন অগাধ বিশ্বাসের সহিত মাদুলিটা সযত্নে বৌএর হাতে পরাচ্ছিলেন তখন শুভা আপত্তি করেও অব্যাহতি পায় নি। সে শুধু মনে মনেই ভাবল 'এ পোড়ারূপ কোন মাদুলিতে ঢাকবেনা'। কিন্তু তখনই আবার মায়ের মনের গুপ্ত আকাঙ্খা ও আগ্রহ বুঝতে পেরে মনের ভিতর কে যেন আগুণের হল্‌কা বহিয়ে দিয়ে গেল!

মা উঠে যেতেই মনে মনে ঠিক ক'রল, আজ সে নিজের জন্য না হ'লেও, মায়ের জন্য তাঁকে পায়ে ধ'রে বোঝাবে—যেন মায়ের সামনে অন্ততঃ তিনি বুঝে চলেন; আমাকে কষ্ট দিন ক্ষতি নাই, আমার নিজের কি আছে, সবইত তিনি। কিন্তু মা আর ক'দিনই বা বাঁচবেন তাঁকে অন্ততঃ একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

* * * *

বে'র পর থেকেই ছেলে পারৃত পক্ষে বাড়ীর ভিতরই আসতনা।

মা ভাবতেন "একি হ'ল, যখন ছেলের বৌ আনিনি তখন ক্ষিতীশ কোথাও যায়নি। আঁচল ধ'রে থাকত—আর আজ কাল তা'কে দেখতে পর্য্যন্ত পাই না।'

শুভা যতদুর সাধ্য মা'র কাছ থেকে নিজেকে ঢেকে নিয়ে নিজে সব সময়ে হাসিমুখে মায়ের পিছু পিছু ঘুরত কিন্তু মায়ের চোখে ধূলো দিতে পারলনা। তাই এখন গোল মিটিয়ে না দিয়ে যেতে পা'রলে যে সংসার গোল্লায় যাবে—ভেবে মা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন; সন্ন্যাসীও সুবিধা পেল—পঁচিশ টাকা আদায় ক'রে নিয়ে গেল।

আজ মাদুলি পরান থেকে তিনদিন। বড় আশায় মা দিন গুণ্‌ছিলেন। 'বিকালে আজ ছেলে—অবাধ্য হবনা'—জানিয়ে দিয়ে, মায়ের আশা কতটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল, সে শুধু মায়ের মনই বুঝতে পারল।

ছেলেদের বুঝি তা' বুঝবার ক্ষমতা নাই। তা' হ'লে সংসারের চেহারাটা অনেকটা বদ্‌লে যেত। মিত্র পরিবারের এ গল্পের ঘটনা হবার সুবিধা,—আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি হ'তনা। মায়ের মনের একটুকু ভাব বুঝতে পারলে ক্ষিতীশবাবু বৌ শুভাকে আপনার মেনে নিতে পারতেন—মাকেও আজ মাদুলি খুঁজে বেড়াতে হ'তনা।

* * * *

ক্ষিতীশবাবু জমিদার, মনে মনে ঠিক করেছিলেন এমন সুন্দরী মেয়ে বে' ক'রে ঘরে আন্‌বেন যে কেউ কখন সেরূপ চোখে দেখ্‌তেই সুযোগ পায়নি। এটা বুঝি জমিদারের জন্মগত সংস্কার—যে তাঁদের অপরের চেয়ে বড় আসন চাই-ই। আর প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার নলিনীবাবুর চর সুরেনমল্লিক তা'তে বাতাস দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

---

[২]

পাড়াগাঁয়ে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার পাশাপাশি থাকলে প্রতিবেশীদের সব সময়ে বিপদের আশঙ্কা নিয়ে থাকতে হয়। কোন না কোন পক্ষে তাদের যোগ দিতে হবেই হবে। বদ-লোকেরা আগ্রহে যোগ দিয়ে পয়সা উপায়ের পন্থা ক'রে নেয়, কিন্তু নিরীহ গরীব বেচারীরাই মারা পড়ে। যে শান্তি পেলে তারা অনাহারে কুঁড়ে ঘরেও সুখে ছেলে পেলে নিয়ে কাটাতে পারে, সে শান্তি তারা হারিয়ে ফেলে।

যশোর জেলার চিত্রা নদীর তটে ঘোষ ও মিত্র পরিবার— দু'ঘর জমিদার অনেক দিন থেকে আছে। যদিও মিত্র-পরিবারের আত্মীয়তা থেকেই ঘোষ-পরিবারের আবির্ভাব হয়েছে, তথাপি এখন অনেক দিন থেকে পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প। সাময়িক শান্তি এলেও সবাই জানে, সে শান্তি বেশী দিন থাকতে পারেনা। মিত্র পরিবারের জমিদার ক্ষিতীশ বাবুর পিতা মারা যাওয়াতে গোলমাল কিছুদিন থেমে ছিল, এখন নলিনী ঘোষ পিতার মৃত্যুর পর জমিদার হওয়াতে সবাই বুঝতে পারল আবার বুঝি আগুন জ্বলে উঠবে—দু'জনেই ছেলে মানুষ, সমবয়সী।

* * * *

মিত্র-পরিবারের বহুকালের আশ্রিত গোবর্দ্ধন সর্দার বেঁচে

থাকৃতে এ বিবাদ মেটার সম্ভাবনাও ছিলনা। সে যে সব সময়ে লোকের কানে কানে তার কীর্ত্তির কাহিনী তার যৌবনের অত্যাচারে ঘোষ পরিবারের কত অনিষ্ট করেছে, না বলে থাকতে পারতনা। যে কালীয়ার চর ল'য়ে দু' পরিবারে প্রথমে বিবাদ আরম্ভ হয়—সে গল্পটাই ছিল তা'র গর্ব্বের জিনিষ!—

'সেই এক কুড়ি বছর আগে একদিন বড় বাবু বল্লেন—'গোবর' কালিয়ার চর যে ঘো যেরা দখল ক'রে নিচ্চে—কি হবে!' যেমন শোনা, আর অমনি "আমি বাছা বাছা লোক ল'য়ে বাবুকে প্রণাম করে যাত্রা কল্লাম"—বলে গেলাম কালের চর দখল করে এসে তবে দেখা কর্‌ব।

'বড় বাবুর চোখ আমার জন্যে ছল ছল ক'রে এলো কিন্তু তখন আমি হাতিয়ার বন্দি হ'য়ে বেরিয়েছি, আর কি ফির্‌তে পারি' বলত তোমরা'—বলে এমন গৌরবে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠত যে শ্রোতা বুঝত, আবার বুঝি গোবরের যৌবনকাল ফিরে এলো। এখানে বাহবা পেলে তবে সে আবার গল্প আরম্ভ কর্‌ত নতুবা ভীরু কাপুরুষ বলে এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শ্রোতাকে অভিনন্দিত কর্‌ত যে তা'র আর গল্প শোনবার প্রবৃত্তি থাকৃত না।

'বড়বাবু আমার সাজ-সরঞ্জাম দেখেই বুঝলেন—খুনই হোক জখমই হোক আমি চর দখল না করে ফিরছিনা, অমনি বলে বসলেন 'না গোবর তোমার যেয়ে কাজ নেই আমি পারি ত নালিশ করে দখল করব।

"খুব ভাল বাসতেন আমায় কিনা, তাই বোধ হয়, যেতে দেবেন না কিন্তু আমি নুন খেয়েছি ; বসে থাকি কি করে—অমনি প্রণাম করে বলে উঠলাম না বাবু তাতে অনেকগুলা টাকা অনর্থক ব্যয় হবে। আপনার অন্নেই মানুষ, হয়ত আপনার কাজেই প্রাণটা যাবে! বলেই তার চোখ ও মুখ স্বর্গীয় কর্ত্তার উদ্দেশ্যে ছল ছল ক'রে আসত—গল্পে কিছুক্ষণ বাধা পড়ত।

'চরে পৌঁছে দেখি কিনা বাবু, পিঁপ্ড়ের সারের মত লোক চর ঘিরে রয়েছে। রামাটাত' বলল "ফিরে যাই চল সর্দ্দার ২।৪ জনের কাজ নয়—বিশেষ চরে উঠতে হ'লে প্রায় বুকজল দিয়ে ২।৪ রশি জায়গা মাড়িয়ে যেতে হবে।"

"আমি চোখ রাঙা ক'রে তখনই বল্লাম,—"ফিরে যাবার ছেলে গোবর্দ্ধন নয় ফিরে যেতে হয় তুই যা। উল্লুকের বাচ্চা তুই —নতুবা তোকে বৃথাই শিক্ষা দিয়েছি।" আমার কথা শুনে রামা বল্‌ল, "না সর্দ্দার, মন বলছে আর বুঝি ফিরে প্রাণ নিয়ে ঘরে যেতে হবে না—চল তুমি শিখিয়েছ তোমার সঙ্গেই যাই।"

'লাফিয়ে উঠে বুকে দুই টোকা লাগালেম কিন্তু প্রাণটা আমারও যেন কেমন করে উঠল, আমার বুড়ো হাড় ক'খানা নয় এখানে রেখে যাব কিন্তু রামাকে না নিয়ে যেতে পারলে তা'র কাচ্চা বাচ্চাদের সামনে কিরূপে মুখ দেখাব।

'একটা মতলব ঠাওরালেম' বলে—এমন ভাবে ঢোক গিল্‌ত যে

বোধ হয় কোন রাজনীতিক তার থেকে বড় চাল কখন বাহির করতে পারে নি।

'পাশের গাঁয়ে কুটুম বাড়ীতে কোন মতে রাত কাটিয়ে রাত থাকতে থাকতে এসে' জলে নামলাম। সবাইকে বলে নেলাম "এগুতেই হবে যা বরাতে থাক—নতুবা ফিরতে গিয়ে পিছন দিলে এক ছেলেকেও ফিরে যেতে হবে না।"

'আগে তারা টের পায়নি। চরে উঠতেই সকাল হ'য়ে এলো, আমাদের ঘিরে ফেললো। রামা একটু আহত হ'তে তার চোখ জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে যে গোঁয়ার একটা কিছু না করে ছাড়বেনা। তা'কে পিছন করে এ হাড় কখানা এগিয়ে দিলেম।

'তা'রা পিছুতে লাগল। রামাকে যে ঘাল করেছে, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে কিনা—সে পিছুতে পারলনা। অমনি রামা দৌড়ে এসে এক কোপ তার কাঁধে বসালে—সে ধড়পড় করতে লাগল!

'আমি রামার দিকে চেয়ে বল্লাম "করলি কি গোঁয়ার—শুধু শুধু একটা প্রাণ নিলি।" ভাববার সময় নেই—দেখলাম সে ধড়পড় করছে, বাঁচবেনা—অমনি ইঙ্গিত করলাম, রামা চেয়ে আর "এক কোপে তাকে সাবাড় করলে'।

'এখন লাশ নিয়ে কি করি—আজকাল বাবু যে পুলি পোলাও হয়েছে তাতে লাশের টুকরা পেলেও যে রক্ষা থাকবে না'—বলে সে শ্রোতার মুখ পানে এমন ভাবে তাকাত, যেন জানতে চায় তাঁরা এ অবস্থায় পড়লে কি করে।

সে ত আর বুঝতনা যে কুড়ি বৎসরপরের বাঙ্গালী আগে থেকে অনেক প্রভেদ হয়েছে। এখন তারা এ সব গল্প শুনতেই ভয় পায়!

'লাশ নিয়ে ত গিয়ে বাবুদের বড় বাগানের কাটাল গাছের গুঁড়ির ভিতর পুরে দিয়ে না খেয়ে গাছে উঠে সারাদিন ত কাটালাম। কতকগুলি কাঁটাল পেড়ে নিয়ে, সন্ধ্যার পর লাশ কুচি কুঁচ করে পুরে নিলাম। শুধু মাথাটা আলাদা রেখে দিলাম। ওর ব্যবস্থাত আর কাছে পিঠে করলে চলবেনা।

ধড়ের ব্যবস্থা নিকটস্থ নদীতে শেষ করতেই সে রাত কেটে গেল।

সকালে দু'জনে বাতাসা পোরা নূতন হাঁড়ি নিয়ে কুটুম বাড়ী চল্লেম। পরামর্শ রামার সঙ্গে এটে নিলেম।

খুলনার নীচে ভৈরব নদীর মাঝখানে খেয়ায় পৌছেছি অমনি রামা বল্ল—"তোমার হাঁড়িতে কি খাঁ সাহেব? দেখাওনা।"

আমি রেগে বলে উঠলাম 'তাতে তোর দরকার কি শূয়রকা বাচ্চা তোর বাবার মাথা'।

'রেগে ঝগড়া করতে করতে তাকে লাথি মারতে হাড়ি সমেত তাকে জলে ফেলে দিলাম নিজেও পড়ে গেলাম।

'জানেন ত বাবু কি নদী! জল কত, ডুব দিয়ে কাজ ফতে করে ভেসে উঠলাম কিন্তু তখনও দু'জনে ঝগড়া করে ডুবে যাচ্ছি।

লোকগুলা সত্যি মনে করে আমাদের টেনে তুল্‌ল। লাশের মাথাও হাড়ির সঙ্গে ভৈরবের নীচে চলে গেল।

'উপরে উঠে দু'জনে খুব হেসে নিয়ে কুটুম বাড়ী বেড়িয়ে এলাম। চার পাঁচ মাস পরে এসে দেখি সব ফর্সা—লাশ পাওয়া যায় নি। সেই থেকে ও বাড়ী আমার বাৎসরিক দশ টাকা বরাদ্দ!

'ঘোষ বাবুরাও কালিয়ার চর হারালেন, এখন সে কত লাভের সম্পত্তি জানেন ত আর এই মেয়াই তার মূল,—বলে গর্ব্বে ফুলে উঠত।

———

[৮]

চিত্রা নদীর পাশ দিয়ে অনেক ঝঞ্ঝা বাত বয়ে গেছে। যে স্রোত তখন বাঙলাকে কাঁপিয়ে তুলছিল, যাতে করে তা'র বহু দিনের অবসাদ বহুদিনের জীর্ণতা ধুয়ে মুছে ফেলে আবার নবীনের সাজে সাজিয়ে নূতন উদ্যমে দেশ-মাতৃকার সেবায় নিয়োজিত করছিল; তা'তে চিত্রানদীর তটও বাদ যায়নি।

সম্যক বুঝতে না পারলেও কেউ চুপ করে থাকতে পারত না। একদল রাজ-শক্তির সহায়তা নিয়ে নিজেদের জাগাতে চায়। অপর দল শুধু নিজেকে চিনতে চায় অপরকেও নিজেদের চেনাতে চায়। আত্মশুদ্ধির এ মহামন্ত্রে কেহ কেহ দীক্ষিত হ'তে লাগল। নবীন যুবা নলিনবাবুও এ সময়ে জমিদার হয়ে একটা কিছু নূতন প্রতিশোধের উপায় আবিষ্কার করতে বসলেন। নূতন উপায় ঠিক করে নিয়ে ক্ষিতীশ বাবুদের গ্রাম বকুলতলার সুরেন মল্লিককে কৌশলে টাকার লোভ দেখিয়ে হাত করে নিলেন।

সুরেনমল্লিকও কাজের লোক ছিল। দারিদ্র্যের নিপীড়নে বৌ ছেলেকে খেতে না দিতে পেরে চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছিল। ক্ষিতীশবাবুর দলের লোক হ'লেও, এখান থেকে আর তার শীঘ্র কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না, তাই টাকার লোভে-বিশ্বাসঘাতকতা

করতে স্বীকার ক'রে বসল, এবং অল্প দিনের ভিতর ক্ষিতীশ বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে দাঁড়াল।

যতগুলো রাজনীতিক চাল আছে এই বিশ্বাসঘাতকতার চালই সব চেয়ে বড় চাল। আর একে গোপনে যিনি যত সদ্ব্যবহার করতে পারেন তিনিই তত জগতে কূট রাজনীতিজ্ঞ বলে সম্মানিত হন।

নলিনী বাবু অনেক ভেবে নিয়ে আজ সুরেন বাবুর সহায়তায় এই চালটি চালতে পণ করলেন। সম্মুখে দাঁড়িয়ে যারা শত্রুতা করে তাদের তত দোষ না দেওয়া যেতে পারে, স্বার্থের জন্যে পরস্পরে শত্রু হ'তে পারে কিন্তু যারা মিত্রতার মুখোস পরে শত্রুতা সাধিতে আসে তাদের গুপ্তবান পৈশাচিক ঘৃণিত হলেও বড়ই ভীষণ, বড়ই অন্তর্দাহী। এর আঘাতে পরাজিত হ'তে হ'লে আর ত :উপায় থাকে না।

ক্ষিতীশবাবুর বড়ই দূরদৃষ্ট, তিনি পরাজিত হ'তে লাগলেন। বিশ্বাসঘাতক পিশাচের নিকট বন্ধুত্বের দাবি করে আত্মসমর্পণ করতে লাগলেন।

সুরেন ক্ষিতীশবাবুর প্রজা, পেটের দায়ে ক্ষিতীশবাবুর বিরুদ্ধে নলিন বাবুর ষড়যন্ত্রের সহকারী হ'ল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাব্‌ত— মুখোস খুলে ফেলি, এত আত্মসমর্পণ করে যে আজ আমার অকপট বন্ধু হ'তে এসেছে তাকে কোলে করে নি ; অত সরল উদার বন্ধু,— কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়্‌ত—ছেলেদের খেতে না দিতে পেরে

তিনিই একদিন দড়ি নিয়ে গাছে উঠেছিলেন কই সেদিন ত কেউ তাকায়নি!

যখন সবাই আত্মশুদ্ধির গৌরবে মন পুরে নিতে চায়—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ভাবের বন্যায় ছুটে যেতে চায়, তখন শুধুই সুরেনবাবুকে বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক মনের ভিতর নিয়ে চলতে হয়েছিল। তিনি নিজেই বুঝতেন সে বোঝা কত ভারি!

●

শুভার বে' হবার পর থেকেই সুরেন বাবুর ঘাড় থেকে একটা মস্ত বড় বোঝা নেমে গেল। শান্তির নিশ্বাস ছাড়তে পারলেন!

বাহিরের শাস্তি এড়াতে পারলেও পাপের বোঝা মনের ভিতর লোক-চক্ষুর অন্তরালে বসে শতগুণ শোধ নিয়ে যায়—আমাদের দুর্ভাগ্য আগে তা' সম্যক বুঝতে পারিনা!

সুরেন বাবু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই ক্ষিতীশ বাবুর নিকট বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে ছুটে এলেন।

বন্ধুরা সদুপদেশ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, জোর ক'রে সৎপথে নিয়ে আসে সেথায় প্রকৃত বন্ধুত্বই থাকে। আর এ বন্ধুত্ব সমানে সমানেই আশা করা যায়। বড় লোকের বন্ধু মোসাহেবেরই নামান্তর। ও কথাটা শুনতে বিশ্রী বলে একটা ভাল কথায় ঢেকে নেওয়া হয়েছে।

মেসের বন্ধু, স্থান বিশেষের বন্ধু, আফিসের বন্ধু, কত যায়গায় যে এই দুষ্প্রাপ্য কথাটার কত অসদ্ব্যবহার করা হয় তা'র আর ইয়ত্তা নেই।

ক্ষিতীশবাবুর শুভাকে বাপের বাড়ী পাঠানর ব্যাপারটায়: মনটা বড়ই ছটফট করছিল। তাই এসে সুরেন বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে বস্‌লেন।

সুরেন হাসি মুখে বল্ল "বস, একবার কথা বলতে আরম্ভ কর্‌লে ত আর ওঠা যাবেনা।"

চায়ের দুধও ঘরে নাই মনে পড়ে—"একটু অপেক্ষা কর আমি দৌড়ে চায়ের দুধটুকু নিয়ে আসি"—বলেই সুরেনবাবু ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে উঠে পড়ল।

হেসে ক্ষিতীশবাবু বল্‌লেন 'থাক না একদিন বা চা নাই হ'ল।"

তাড়াতাড়ি সুরেন বল্ল "তা' কি হয় ভাই এই গরীবের পর্ণ-কুটীরে তোমার মত বন্ধুর অভ্যর্থনা করতে যে আমার আর কিছুই নাই! একটু চা না দিলে চল্‌বেনা—বিশেষ চা খেতে খেতে গল্পটা জমে ভাল।"

ক্ষিতীশবাবুর আজ আর গল্প করবার মত প্রবৃত্তি ছিলনা। আবদারে নাতি বাবার কাছে তাড়া খেলে যেমন ঠাকুরদাদার কাছে ছুটে আসে, কারণ সেখানে আবদার পায়; তেমনি মার কাছে তাড়া খেয়ে আজ ক্ষিতীশবাবু মোসাহেব বন্ধুর কাছে ছুটে এসেছে।

"না ভাই সুরেন, আজ আর কিছু ভাল লাগচেনা। আজ মনটা বড়ই খারাপ লাগছে।" ক্ষিতীশ গম্ভীর ভাবে বল্‌ল।

"আচ্ছা ভয় নাই" সুরেনবাবু হাসতে হাসতে বল্ল "চা দিয়ে আমি ঠিক ক'রে দেব। তুমি একটুমাত্র অপেক্ষা কর ভাই।"

আজ কিসের বেদনার অনুভূতি হচ্ছিল ক্ষিতীশবাবু নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

পরের মনে আঘাত দিতে গেলে নিজের মন ছাড়ে না—আঘাতের প্রতিঘাত হতে থাকে, এ প্রকৃতির নিয়ম।

ক্ষিতীশের মনে হচ্ছিল—'শুভ: এক বাড়ীতে থাক্‌লে এত তাঁর কি অনিষ্ট কর্‌তে পারে, যে তাকে না পাঠালে শান্তি হচ্ছিল:না। আর তা নিয়ে আজ মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি কর্‌তে হ'ল; আর এত বড় বাড়ীতে কি তুজনার স্থান হতে পারে না। ওকেই বা আমার এত শাস্তি দিতে আগ্রহ কেন!'

নির্জ্জনতা মন্দ লাগ্‌ছিলনা বল্‌লেন,—"আচ্ছা তুমি যাও ভাই আমি একটু বরং বসি—"

সুরেন বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে পান সাজতে ব'লে তাড়াতাড়িতে ভুলে পান না দিয়েই দুধ আন্‌তে বেরিয়ে গেলেন।

যতই বন্ধুত্বের দাবি করুন না কেন সুরেন বুঝত, ক্ষিতীশ জমিদার ধনী—অস্থিরচিত্ত যুবক, তার পক্ষে একটু ত্রুটি হইলেই রক্ষা থাকবেনা।

তার ভাইপোই এত দিন তার অবলম্বন ছিল, নিজে ভাইপোর চাকরি হওয়ার পর থেকে হেসে খেলে কাটিয়েছেন। বাকি দিন

বেশী তিনি কেন, কেউ কোথায় স্বচক্ষে দেখেছে শুনতেও পাননি।

ঐ রূপের দিকে একবার কেন, যুগ যুগান্তর ধরে চেয়ে থাকলেও চোখের তৃষ্ণা মিটবে না, পলক পড়বে না। ছবি সরে যেতেই তা'র চমক ভাঙ্‌ল, কে এ সুরেনবাবুর বাড়ীতে, মাথায় ত সিন্দূর নেই, তবে কি কোন দূর সম্পর্কীয়া অবিবাহিতা। ভাবের আতিশয্যে বিধবার চিহ্ন সব তা'র চোখ এড়িয়ে গেল। নিজের মন নিয়ে বেশী ব্যস্ত থেকে আমরা অনেক ভুল করে থাকি, ইহা নূতন নয়।

মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগ্‌তে লাগল; তাকে চাপতে পারছিলেন না। ও রূপের কাছে—তিনি নিজে জমিদার, তা'র যে পদমর্য্যাদা আছে—সব ভুললেন, দরকার হ'লে আজ তিনি সব বিনিময় করতে পারেন। সুরেনবাবু এলেই জিজ্ঞাসা ক'রবেন ঠিক ক'রলেন—কিন্তু লজ্জা—বড়ই লজ্জা ক'রতে লাগল।

শৈলজা চারুকে লক্ষ্য করছিল। চারু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেই নত মুখে বলল,—

"কাকিমা, কাকাবাবুত ওখানে নেই, কে আর একজন বসে রয়েছে।"

চারুর ব্যবহারে শৈলজা সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না, বলে উঠলেন "তবে পান কাকে দিয়ে এলি?"

চারু মুখ নত করেই বলল "দরজার কাছে বাটা সমেত রেখে এসেছি, পান নিয়ে ত ফিরে আসতে পারলুম না।"

শৈলজার বড়ই রাগ হইল। একটু জোরেই বললেন,—"আমি কি তোকে তাই বলছি। যে ফিরিয়ে আনলি না কেন; হতভাগা মেয়ে! ভদ্রলোকের মান জান না।"

"আমি ত ওঁকে চিনি না কাকিমা!" বলে চারু কাঁদ কাঁদ মুখ করে ফেলল।

"ওঁকে চিনবে কেন? উনি হ'লেন দেশের জমিদার। চিনবে যত ছোট লোকদের—তা' যেমন বরাত করেছ তেমন লোকদেরই চিনবে।"

*   *   *   *

সুরেন বাবুর ভাইপো কিরণ বিদেশে থেকে লেখা পড়া শিখলেও মাঝে মাঝে ছুটীর সময় বাড়ী আসত, তখনই সে দুই চার দিনের খুঁটী-নাটী ব্যাপারের ভিতর দিয়ে তার কাকিমাকে চিনতে সুবিধা পেয়েছিল।

কিরণ আই. এ. পাশ করে বাড়ীর অবস্থা ভাল না থাকাতে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে যশোর সদর কাছারীতে সামান্য চাকুরী পেয়েছিল; এবং তারই এক আত্মীয়া অনাথা সুন্দরী মেয়ে চারুকে বে' করে ষ্টেশনের নিকট এক সামান্য বাসা ভাড়া নিয়ে দু'জনে সুখে থাকতে আরম্ভ করিল।

গরীবের অনাথা মেয়ে বে' করাতে কাকা সুরেন বাবু সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি; বললেন,—"তোর জন্য খাটী, তুই যখন কিরণ, তা' বুঝলি না তখন আর আমি খাটব না। আমার ত আর ছেলে

নেই, দুটো পেট ত এক রকম ক'রে ভগবানের আশীর্ব্বাদে চলে যাবে।"

কিরণ বিনীতভাবে উত্তর করেছিল "সে'ত ঠিক কথা কাকা! আপনি কেন চিরদিন খাটবেন। এখন আমার চাকরি হয়েছে। এখনও যদি আপনাকে খাটতে হয় ত—"

"তুই বলিস আর না বলিস আমি আর খাটছি না। তবে তোর সাধের বৌ নিয়ে তুই ঘর কর।" রাগের মাথায় সুরেন বাবু বলে উঠলেন।

"আপনারই ত পুত্রবধূ কাকা, তবে দিন কতক এখানে থাকুক, মেসে খরচ বেশী পড়বে। গরীবের মেয়ে অল্পে চালাতে পারবে।" অভিমান ভরে কিরণ উত্তর দিল।

কাকার নিকট কিরণের সঙ্গত অভিমানের কারণ ছিল। তিনিই ত এত দিন তাকে টেনে বেড়িয়েছেন। কোন দিনের তরে বুঝতে দেন নি, কিরণের কোন আবদার—যতই অসঙ্গত হ'ক না কেন—কাকার নিকট সঙ্গত হবে। সে জানত না, অবিবাহিত ছেলেদের আব্দার বিবাহের পর অনেক সময় উপেক্ষিত হয়—এর একটা কারণও আছে বই কি!

কিরণ চায়না, চারু কাকিমার কাছে গিয়ে এখন থেকেই সংসারে ষোল আনা স্বার্থ শিখে নেয়। বিশেষ কাকিমার ধর্ম্মজ্ঞানটাও বড় প্রবল ছিল না, তিনি যেমন কাকার সঙ্গে ব্যবহার করেন তা যদি ছোট কাল থেকে শিখে নেয় তা হ'লে তাকে বিশেষ ভুগতে হবে।

তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৌকে কাছে রাখবার আজ্ঞা পাবামাত্র কিরণ সম্মত হ'ল, বলল,—"হাঁ কাকা দিন কতক এখানেই থাক— পরে একটু বুঝতে পারলেই আপনাদের সেবা শুশ্রূষা নিজেই ক'রতে চাইবে।"

"সে আশা আমি বড় করি না—তোরা সুখে থাকলেই হ'ল" বলে কাকা চলে এলেন।

কিরণ জানত অস্থির চিত্ত কাকার রাগ শীঘ্রই পড়ে যাবে অথচ রাগের মাথায় আজ তার কার্য্য সিদ্ধ হল। যদিও অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে আজ তাকে এ পথ নিতে হচ্ছিল।

তার মনে পড়ল তা'র মার সঙ্গে তার কাকিমার ব্যবহার —যে সংসার মা আসতে উথলে উঠেছিল, সেই সংসার তিনি আসতেই উড়ে গেল। ঘর পুড়ল, আত্মীয় স্বজন মারা গেলেন, শুধু থাকল বিধবার দিবারাত্রব্যাপী করুণ-ক্রন্দন, আর অভাবের দারুণ অত্যাচার।

এর পরও কাকিমার মুখ থামল না—"বড় লোকের মেয়ে, বাপ বুদ্ধির দোষে এমন হাড় হাভাতের ঘরে দিয়েছেন যে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটেনা" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে বসতেন। কিন্তু তার বাপের বাড়ীর অবস্থা তিনি ছাড়া আর সবাই জানত ও বুঝত; তবে কেউ সে দিকে মন দিত না। একে একে পরপারে চলে গিয়ে তা'কে এড়াতে লাগল।

শুধু কিরণের মা, যাবার সময় কিরণকে কাছে ডেকে নিয়ে

পবিত্র মৃত্যুশয্যা ছুঁইয়ে ব'লে গিয়েছিলেন "বাবা যদি ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন আর কোন দিন, ঘর সংসার করবার বরাত হয়, তবে বাবা এ বাড়ীতে বৌকে কখন রাখিস নি, তা হ'লে সংসার ধর্ম্ম করতে পারবি না, রাক্ষসীর নিশ্বাসে সব ভস্ম হ'য়ে যাবে। বাবা আমাদের সোণার সংসার ছিল. আজ কোথায় উড়ে গেল বুঝতে পারলেম না ; যাই বাবা—" বলে বিধবা শেষ উপদেশ দিয়ে চোখ বুঝলেন। কিরণের স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর সে অনুরোধ এখনও তার কাণে বাজছিল। অতি দুঃখের সহিত কাকার সঙ্গে এক মত হ'তে না পারলেও আজ শান্তির নিশ্বাস ফেলে সংসার পাতল।

* * * *

স্বাধীন ভাবে দুটিতে কুড়ে ঘরে বাসা বেঁধে বড়ই সুখে কাল কাটাচ্ছিল। নিজেদের ঝগড়া নিজেদের অভিমান নিজেরাই মেটাত। এক ঘরের আলো বাতাসে উভয়ে এক আদর্শে বড় হয়ে উঠছিল। কিন্তু দুজনেরই মাঝে মাঝে মনে হ'ত এত সুখ বুঝি এ পৃথিবীতে হবার নয়। মাঝে মাঝে মন কেঁপে উঠত যখন দেখত হরিধ্বনির সঙ্গে পাশের বাড়ীর সদ্য বিধবার মৃতস্বামী সংসার ছেড়ে চলল, যখন শুনত অমুকের বড় সাধের স্বামী আজ স্ত্রীকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে অপরে আসক্ত। পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সেদিন তারা সুধু পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রাত কাটাত। মুখে ভাষা জুটত না— মনের ভাষায় মনের সঙ্গে যে বন্ধন হ'ত সে বন্ধন ছিড়বার নয়—

তা' মৃত্যুকেও জয় করে নিয়েছে। কোন ভয় তখন তাদের মনের কাছে আসতে পারত না।

সতীর এ প'ত মিলন বোঝাবার জিনিষ নয়; এ শুধু বুঝবার জিনিষ। এ বলবার কথা নয়—ভাববার কথা। আর সে ভাবনায় সেই ডুবে যেতে পারে, যে যথার্থ প্রেমিক—যে যথার্থ ভালবাসার ক্ষণিক আস্বাদ অন্ততঃ একদিনের তরেও পেয়েছে।

কিন্তু সে প্রেম-উন্মাদকে নিয়ে ভয়ও আছে। সে তখন জগতের উপরে উঠে যায়। নিজের অনির্ব্বচনীয় সুখে নিজের অভাব পুরে নিয়ে প্রাণকে তখন তুচ্ছ করে ফেলে।

ঠিক এমনি সময়েই পরের স্বামীকে দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভীষণ আহত হয়ে, কিরণ সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আনীত হ'ল। সতীর আকুল ক্রন্দনে ও চিকিৎসকের শত চেষ্টায়ও তাকে ধরে রাখতে পারল না।

ছেড়ে যাবার সময় চারুকে কাছে নিয়ে হাতের পর হাত রেখে বলে গেল,—

"চারু, আমিত চল্লুম! সান্ত্বনা হচ্চে—একটা সৎকাজে নশ্বর জীবনটা দিতে পারলুম, কিন্তু বড় দুঃখ তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্চে—ও কি কেঁদ না, কাঁদবার সময় ঢের পাবে কিন্তু আমার দেখা আর পাবে না!"

চুপ করে থেকে কিরণ বলতে লাগল "অনেকদিন তোমার জন্য ওপারে হয়ত অপেক্ষা করতে হবে। হ'ক তুমি অপরের

উপকার করতে এখন সময় পাবে। আমি তোমায় আটকে রেখেছিলেম - তোমার সংস্থান থাকল না। যা কিছু সামান্য টাকা বেচেছে কাকাকে দিয়ে এসেছি। এখন তিনি তোমার আশ্রয় স্থল — তবে খুব সাবধান, এতদিন বলিনি কাকিমা অবোধ —"

কিরণের আর কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে এল না। সতী চুপ করে বুক বেঁধে মুখপানে চেয়ে রইল।

সব ফুরিয়ে গেল, তবু কিরণের সংজ্ঞা হ'ল না। চারি বৎসরের ভিতর তার সংসার করা শেষ হ'ল। দু'চার জন বন্ধুরা এসে মৃতের শেষ কর্ম্ম শেষ করল।

আর চারু—তার কাণদিগে মনের ভিতর স্বামীর শেষ কথা শুনতে শুনতে সদা বিধবা বেশে কাকা সুরেন বাবুর সঙ্গে তা'র শেষ নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় স্থল বকুলতলায় এলেন।

বালিকা কাকার মুখের দিকে চেয়ে শরীরের পর যথেষ্ট অত্যাচার করতে পারল না; কিন্তু তখন তা'র কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

কাকিমার অত্যাচার আজ সে দু'মাস অবাধে অম্লান বদনে স'য়ে এসেছে। এ যে তার এখন সবার নিকট প্রাপ্য—এতে কিছু তার আসে যায় না।

বকুলতলার কেউকে চিনবার তা'র সুবিধা হয়নি; মাত্র চিনত একজনকে—তবে তাকে এমন চেনা চিনত যে আজ পর্য্যন্ত কেউ বোধ হয় কাউকে অত চিনতে পারেনি।

স্মৃতি-পূজা

চারুর কাছে আজ সবাই সমান—তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ক্ষিতীশবাবুই হ'ন বা দুঃসাধ্য রোগগ্রস্ত জীর্ণ কুটীরবাসী ভিক্ষুকই হ'ক। তাকে সেবা করবার সুবিধা দেও, সে সবাইকে মা'র মত শুশ্রূষা করবে—নতুবা ঘরের কোণে আটকে থেকে বাকি দিনগুলা মুখ বুঝে খেটে খেটে কাটিয়ে দেবে।

*　　•　　•　　•

চারুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শৈলজার বড়ই রাগ হ'ল। তা'র স্বামী তা'র কথা অবহেলা করলে তিনি কুরুক্ষেত্র ক'রতেন, আর এই ছুঁড়িটা আজ রূপের গরবে তা'র কথা কাণে না তুলতে সাহস করছে।

রেগে বলে উঠলেন,—"গরবিনি, আমার কথা কাণে ঢুকল না। এই ক্ষিতীশবাবুর অনুগ্রহেই যে গিলতে পারছ তাবুঝি এতবড় ধাড়ি মেয়ে হয়েও বুঝতে পার না।

"এরপরে গেলা আসবে কোত্থেকে, যাও বাছা, পান দু'টা কাছে দিয়ে এসোগে, ভদ্রলোকের অপমান ক'র না, খাতির যত্ন করতে শেখ, আর আমি ক'দিনই বা—' এই বলে মুখ এমন করলেন চারু ভাবল সত্যিই বা সে অপমান করেছে।

কিন্তু লজ্জা করলে ত লোককে অপমান করা হয় না বরং পরের সম্ভ্রম, মর্য্যাদা রাখতে গিয়েই আমাদের লজ্জা আসে। শিয়াল কুকুরকে কেই বা লজ্জা করে।

চারু নতমুখে পান দু'টা এগিয়ে দিয়ে আসতে গিয়ে দরজার

কাছ থেকে দেখতে পেল ক্ষিতীশবাবু পান চিবুতে আরম্ভ করেছেন, ফিরে এল।

ক্ষিতীশ, চারুকে পুনরায় এসে উঁকিমেরে চলে যেতে দেখতে পেল। নির্জন ঘরে যুবা পুরুষ একা, তাতে দু'বার দেখল।

তা'র তা সহ্য করে অন্য কোন মানে ঠিক করবার ক্ষমতা ছিল না, সারামন বিদ্রোহী হয়ে তখন কেবলই ভাবছে, তবে কি—

একা ভালবাসতে সে কখনও শোনেনি। আর নিজের চোখের নিজের মনের প্রত্যুত্তর পাওয়া যাচ্চে না, এটা ক'জনাই বা আজ পর্য্যন্ত ভাবতে পেরেছে। নিজের মনের অবস্থার সঙ্গে সবার মন সব সময়ে সমান ক'রে নিতে চাই।

অসংযমী বিদ্রোহী মন নিয়ে ক্ষিতীশ আরও দুটা পান চাইতে গিয়ে পেরে উঠল না। অমন রূপকে বুঝি হুকুম করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করা তার মত যুবাপুরুষের পক্ষে অনেক সময়সাপেক্ষ।

কপাল দোষে চারু আজ তার ভুবনভোলান মূর্ত্তি নিয়ে অসংযমী যুবকের কাছে নিমেষের দেখা দিয়ে পবিত্রমনে বাড়ীর ভিতর ঢুকল—ঢুকেই বলল, "না, পান তিনি নিজেই নিয়েছেন কাকিমা—" ব'লে সবদিক রক্ষা হ'ল দেখে একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলল কিন্তু কাকিমা তখনই বলে উঠলেন—

"যাও বাছা আর দুটা পান সেজে দিয়ে এসগে—একা একাত ব'সে আছেন। তিনি কখন যে আসেন ঠিক নেই, কাছেত আর দুধ পাওয়া যাবে না।"

এবার চারু আর নিজেকে সামলাতে পারল না ; ভাবল, তবে কি পান দিতে হুকুম করাটা শুধু তাকে অপমান করা।

চারুর আর সহ্য হ'ল না। আস্তে আস্তে পানের ডিবের কাছে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

সুরেন বাবু দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই চারুকে দেখতে পেলেন, তাড়াতাড়ি বল্লেন, "যাও না, একটু চা তৈরী করগে, আর দুটা পান সেজে দেও।

চারু তাড়াতাড়ি পান সেজে কাকার হাতে দিয়ে দুধ নিয়ে উঠে যেতেই, শৈলজা ঝড়ের মত এসে বল্লেন "না গো বাছা তোমায় যেতে হবে না, যে লজ্জা হয় ত বা চাটুকু পুড়িয়ে ফেলবে। দুটা পান সাজতেই বছর কাটিয়ে দিলে। দেও, আমি যাচ্চি, তুমি তোমার কাজে যাও।"

চারু দুধের বাটী রেখে আস্তে আস্তে সরে গেল।

শৈলজাই এ যাবৎ চা তৈরী করে এসেছে। সুরেনবাবু একদিন চারুর হাতে তৈয়ারী চা খেয়ে স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আজ কে চা করেছে ?"

শৈলজা ভাবল তার মত তৈয়ারী অপরে করবেই বা কিরূপে— হাসি মুখ টেনে এনে বল্লেন "বলনা গো—কেন কি হয়েছে ? খেতে পারছ না বুঝি, তা আমি আজ তৈরী করবার সময় পাইনি। ছুড়িটার ত কোন কাজ ছিল না, আর ও বল্ল 'আমি জানি' তাই ওকেই করতে বলেছিলেম।"

সুরেনবাবু না ভেবেই বলে উঠলেন—"তা খেতে ত বেশ হয়েছে—"

শৈলজা অমনি কাঁদ কাঁদ মুখে বলে উঠল "আমার হাতের জিনিষ কবেই বা তোমার পছন্দ হয়েছে, আবার না হলেও ত চলেন দেখি—"

সুরেনবাবু হাসি মুখে বলে উঠলেন "তুমি করবে না ত কে আমার কাজ করবে ?"

"তা' আমিই করি বটে কিন্তু—"

এর উত্তর দিতে সুরেনবাবুর সাহসে কুলাল না, তিনি শৈলজাকে চিনতেন, বিরক্ত হয়ে বাহিরে চলে গেলেন।

শৈলজাও চায়ের কাছে আর ঘেসতেন না। কিন্তু দু চার দিন যেতে না যেতে একদিন এমন কুরুক্ষেত্র করে বসলেন, আর এমন সব ইঙ্গিত করলেন যে চারুর আর চা তৈরী করতে যেতে প্রবৃত্তি রইল না।

সে ত কখনও কপাল পোড়ার পর থেকে চায়ের দিকে ফিরেও তাকায়নি !

আজ কাকা মশায় নিজেই দুধ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চারু বিপদে পড়েছিল কিন্তু শৈলজা তার বিপদ কাটিয়ে দিয়ে গেল।

* * * *

সুরেনবাবু পান হাতে ঘরে ঢুকতেই দেখলেন ক্ষিতীশ এক মনে যেন কি ভাবছে। পান দিয়ে বলে উঠলেন—"কি ভাবছেন ?"

অন্যমনস্কভাবে ক্ষিতীশ বলিল "কি করব ভাই, বরাতের কথা ভাবছি।"

"আপনাদের বরাতের কথা কি বলছেন বাবু! টাকা পয়সার অভাব নেই—এখানে এমন কার মাথা আছে মিত্রপরিবারকে সেলাম ঠোকে না।" সুরেনবাবু না বলে থাকতে পারলেন না।

"তা হ'লেই কি সব হ'ল সুরেন! আমার কি আর সাধ আহ্লাদ নেই?" ক্ষিতীশবাবু কথাগুলা বড় হতাশার স্বরে বলে উঠলেন।

"আপনি বাবু বিদ্বান, বুদ্ধিমান। আমার ত মাথায় আসে খেয়ে পরে জগতে কাটিয়ে যেতে পারলেই হ'ল।" সুরেনবাবু বললেন।

সুরেন ক্ষিতীশের চেয়ে বয়সে ঢের বড় ছিল। জগতের সারধর্ম্ম সংসার-ধর্ম্মের মূল আধার তা'র স্ত্রীর ব্যবহারে সব সময়ে তার মনে বড়ই আঘাত করত, তাই আজ সে সংসার ধর্ম্মের সুখ হারিয়ে পাথরেরই মত কঠিন হৃদয় নিয়ে বেড়াত।

সে বুঝতেই পারল না প্রাতঃস্মরণীয় বংশের কন্যা সুন্দর-মুখশ্রী লক্ষ্মী-মেয়ে শুভাকে অঙ্কলক্ষ্মী করে কেন ক্ষিতীশ বাবু ভেঙে পড়ছেন। সুরেনবাবু তাই বললেন,—

"আচ্ছা বাবু, একটা কথা বলব কিছু মনে ক'রবেন না!" বলে সুরেন ক্ষিতীশবাবুর মুখের দিকে চাইল—যেন সে কত বড় একটা গোপন কথা আজ বলবে।

ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে ক্ষিতীশবাবু বলে উঠলেন "দেখ সুরেন,

হ'য়ে সুরেন এ দৃশ্য দেখতে লাগল। তার চোখেও জল—ক্ষিতীশ বাবুকে সে ভাল বাসতে শিখেছে।

কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও করুণ দৃশ্য মনকে করুণ করে তোলে। অপরের চোখের জল নিজের চোখে জল আনে। এখানেই সংসারের মহত্ত্ব—আর এই মানবের দেবত্ব।

ক্ষিতীশ মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারল মনের দুর্ব্বলতায় সে কি করে ফেলছিল। একবার কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে যে কি হ'ত সে ভাবতেও পারল না; সামলে নিয়ে শক্ত হয়ে উঠে বসল।

মন যত কিছু ভাবুক না কেন কথা না বলা পর্য্যন্ত সে সাধু।

সুরেন ক্ষিতীশবাবুর চোখের জলের কারণ ভেবে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে বলে উঠল,—"ক্ষিতীশবাবু, বৌদির কথায় তুমি এত ব্যথা পাও, তোমার উচিত নয়। আমি নলিনবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা জানি মনে ছিল বলবনা কিন্তু আজ না বলে পারছিনা। যদি নলিনবাবুর মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে তোমার কোন উপকার হয়! তুমি জাননা নলিনবাবুর কি মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয়, মা'র কি মহৎ জলন্ত উদ্দেশ্যের ফল—তোমার ও বৌদির এই বাঞ্ছিত শুভ-মিলন।

ক্ষিতীশবাবুর লম্বাচওড়া বক্তৃতা শুনবার মত প্রবৃত্তি না থাকলেও নিজের বিদ্রোহী মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এখন সময় চায়। অভাবনীয় ব্যাপারে আজ তার মন গোলমাল হয়ে উঠেছে, চুপ করে এমন ভাবে রইলেন যেন তিনি সব শুনতে চান।

সুরেন বলে যেতে লাগল—"যখন বাবু দুবেলা দুমুঠো অনেক চেষ্টা

করেও জুটতনা। সংসারের পর ঘোর বিতৃষ্ণা এসেছিল। সত্যি বলুনত খেতে না পেলে লোকে কি না করতে পারে?" সহসা সুরেন ক্ষিতীশবাবুর মুখেরদিকে তাকিয়ে নিল। বড় কাতর সে দৃষ্টি—যেন কত ক্ষমাভিক্ষা চায়।

"আমাকে তখন একদিন নলিনবাবু ডেকে নিয়ে—আপনার পর নজর রাখতে বল্লেন আর যা বলেছিলেন এখন আর তা এ পাপ মুখে সরছেনা।"

ক্ষিতীশবাবু বলে উঠলেন,—"আমার পর নজর রেখে নলিনের লাভ!" এই নূতন ষড়যন্ত্রে ক্ষিতীশবাবু চমকে উঠলেন।

"আপনিইত বাবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী, আপনার পর তার নজর রাখা কি উচিত নয়! আর আপনার চরিত্র বিপথগামী হতে পারে কিনা জানতে চেয়ে ছিলেন।" একথা সুরেন চঞ্চল কাতর স্বরে না বলে পারল না।

ক্ষিতীশ উৎসুক হয়ে বলল,—"তারপর কি হল?"

সুরেন বলল, "কি যে হল আমিই বুঝতে পারলুম না—তাকে আমি আপনার শত্রু বলে জানতুম। তারপর আমি যে কতকটা চালাকি চালাতে না গিছলুম, কিছু ফাঁকি দিয়ে আদায়ও করতে না গিছলুম—তা নয়; আজ আর মিথ্যাকথা বলবনা বাবু—"

ভাবের আতিশয্যে সুরেন বলে যেতে লাগল,—কিন্তু নলিনবাবু আপনার সব কথা শুনে বলে বসলেন—'সুরেন, তোমার কাজে তুষ্ট হলেম। আর তোমার কাজ নেই এখন আমার কাজ।' আমি

জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—তিনি বললেন, —'সবই জানতে পারবে কিন্তু তাতে কিছুই আশ্চর্য্য হবার থাকবে না। আমি এ দুপরিবারের গোলমাল চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দেব।'

'বাঙ্গলার চারিদিকে যে জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি মনে কর সুরেন আমরা অন্ধ? আজ এমন ভাবে ঐ গোলমাল মেটাব যে কোনদিন কিছুকালের ভিতর কালিয়ার চরের ব্যাপার আর না হতে পারে।

'এরপর আর ক্ষিতীশের হাত উঠবেনা যদি বা ওঠে তবে সেই মারবে আর আমাকে শুধু সে মার বসে বসেই খেতে হবে। আর যে আমার কোন উপায়ই থাকবে না। বলে নলিনবাবু গম্ভীর হলেন—

''আমি তখন বাবুর মতলব বুঝিনি· তাই বোকার মত বলে বসলেম—কেন আপনিই বা তার চেয়ে কিসে কম?

'নলিনীবাবুর চোখ জ্বলে উঠল—বললেন "কম বেশীর কথা কিসে এল। আর এই সব কথা উঠেই আজ আমাদের সোণার বাঙলার ভাই ভাইদের ভিতর এত ঝগড়া এত কলহ। 'আমি চাইনা সুরেন যে আর আমরা ভাই ভাই ঝগড়া করব, বরং হাত ধরাধরি করে এক মহৎ উদ্দেশে দেশ মাতৃকার সেবায় ছুটে যাব। বড় কাঙালিনী মা আমাদের, তথাপি না বুঝে আমরা দিন রাত ঝগড়া নিয়ে আছি।

"দেখলুম যেন একটা কিসের গর্ব্বে কি একটা মহান জ্যোতিতে নলিনবাবুর মুখভরে গেল। সে মহান দৃশ্য ক্ষিতীশবাবু আপনি যদি একবার দেখতেন তবে আজ তারই বোন বৌদিদিকে আমার একটুও

অযত্ন করতে প্রাণ থাকতে পারতেন না।" সুরেনের বক্তৃতায় নলিনবাবুর ব্যবহারে ক্ষিতীশবাবু বুঝি মুহূর্ত্তের তরেও উন্নত তাই শুভার কথায় বাধা দিলেন না চুপ করে শুনতে লাগলেন।

বক্তৃতায় ও উদাহরণে মনটাকে উঁচু করে গভীর চিন্তা স্রোতে তাকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে জগতের মহান কল্যাণে পৌছে দেয়। কিন্তু সব সময়ই তা হয়না। ক্ষণিকের উত্তেজনা ক্ষণিকেই নিবে যায়। মোহ মদিরার নেশা কেটে গেলেই স্বার্থের দাস তার ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ভুলে থাকে। তাই ভালকথা মহৎ উদাহরণও বৃথা হচ্চে। যে যত বড় স্বার্থের দাস তার মোহ কাটাতে তত বড় ত্যাগের সাধনা চাই।

সুরেনের মনও আজ কৃতজ্ঞতায় পুরে গেছে। সব কথা তাঁকে আজ যেন বলতেই হবে। সে বলে যেতে লাগল।

'মা ও নলিনবাবুর মহৎ ইচ্ছা বুঝতে পারলেন। বাধা দিলেন না এ শুভ মিলন ঘটালেন। ক্ষিতীশবাবু এ শুভ মিলন বড় শুভক্ষণের রাখীবন্ধনের প্রীতি সম্মিলন! তাকে মলিন হতে দিওনা।

ক্ষিতীশবাবু আমি নলিনবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে বোনকে সঁপে দেবার পূর্ব্বে ভাবতে বলেছিলাম এতে আমাদের স্বার্থ ছিল কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না বললেন,—"ক্ষিতীশের মা জমিদারের পরিণীতা জমিদারের মাতা, তিনি আমার মর্য্যাদা নিশ্চয় রাখতে পারবেন। বোনের আমার তিনি বেঁচে থাকতে কোন ভয় নেই মা'র মুখের দিকে চেয়েও আপনি আজ শান্তি পান।

ক্ষিতীশের মনে আজ দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত। কোন পথে চলতে হবে। কিছুই তখন বুঝতে পারছেন না। চারিদিক বুঝি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর দিকে চল্লেন। রাত্রি অনেক হয়েছে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শয্যা আশ্রয় করলেন।

---

[৪]

শুভা বিকেলে গাধুয়ে আসতেই তার বাপের বাড়ীর দাসী এসে হাজির হল। দিদিমণির বৈকালিক চুল বেঁধে দেওয়া তা'র একটা নিত্য কাজ ছিল। শুভারও তা'র চুল বাঁধা না হলে পছন্দ হত না।

চপলাকে ঠিক দাসী বলা যায় না। সে কোন দিন আজকালকের দাসীর ব্যবহার কখনও পায়নি। সেকালের সখি বললে বরং তাকে মানায় কিন্তু সে কাল যে অনেকদিন চলে গেছে।

শুভা চপলার কাছে অনেক কথা বলতে পারত। মনের কপাট খুলে দিত।

স্বামীর অপছন্দ ভাব, মানসিক বিরক্তি শুভা এতদিন শুধু নিজের মনেই আবদ্ধ রেখে ছিল বাহিরে বুঝতে দিত না। নিজের মনেই নিজে গুমরে মরত।

স্বামীর অনাদর স্ত্রীর হৃদয়ে বিষম বাজে কিন্তু সেই বিরক্তি যতক্ষণ পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ বরং সহ্য করতে পারা যায় কারণ স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের ভিতর অপরের অজানা অনেক গোপন কথা থেকেই যায়। মান অভিমান কলহ পূর্ণ সে সম্বন্ধ নিত্য নূতন ভাব ধরতেও জানে ধরাতেও জানে রোজ ভাব বদলায় চিরদিন একভাবে থাকে না। জীবন মরণে অবিচ্ছিন্ন সে সম্বন্ধ অনেক আঘাত নীরবে সইতে জানে কিন্তু যখন তা বাহিরে প্রকাশ হয় তখনই

মন একদম ভেঙে পড়ে। এ যে বড় হৃদয়ের মধুর সম্বন্ধ বাহিরের নয়—মনের, তাই বাহিরের আঘাত সহ্য করতে পারে না। স্বামীর মান মর্য্যাদাই যে আবহমান কাল থেকে স্ত্রীরও মান মর্য্যাদা; স্বামীই যে স্ত্রীর একমাত্র আশ্রয় দাতা।

তাই আজ যখন ক্ষিতীশবাবু মাতার নিকট শুভাকে বাপের বাড়ী পাঠানর প্রস্তাব করছিলেন তখন স্বামী অনাদৃতার লজ্জায় ঘৃণায় মাটার সঙ্গে মিশিয়ে যেতেই শুধু ইচ্ছা হচ্ছিল। এখনও সে ভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

চপলা এসেই বলল— "এস চুল বেঁধে দি!"

"না তোর আর রোজ রোজ চুল বাঁধতে হবে না।" বলে শুভা চুপ করল।

"সেকি কথাগো—চুল বাঁধবেনা কি গো—তা হলে যে দাদামণি ভালবাসবে না" চপলা হাসি মুখে বলল।

শুভা বেদনা জড়িত সহাস্য মুখে বলল এখন ত বাসতে কাম্নাই নাই আর সং সাজব না, যে দেখবার সেই যদি না দেখল।

চপলার চোখ শুভা এড়াতে পারল না। বাপের বাড়ীর লোক সে। তুজনে এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছে।

চপলা সব সময় হাসি ঠাট্টায় সময় কাটিয়ে দিত। কিন্তু আজ তা'র শুভার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সব কথা ফুরিয়ে গেল।

চপলা চুপকরে সজল নয়নে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শুভার মনও

সমবেদনায় পুরে এল বল্‌ল,—"তুই যখন ছাড়বিনা ত বাঁধ, কালমুখ তুই যদি ঘসে মেজে একটু ফরসা করতে পারিস।"

চপলার মুখ ফুটল—"মুখ ফর্সা করবার এতে কিছুই নেই। আমি তোমার এ রোগের ঔষধ বলে দেব। দিদিমণি শুনবে?"

শুভা হাসির সহিত বল্‌ল,—"তোর দেওয়া ঔষধ আমার কি কাজে আসবে? আর তোকে শেখালেই বা কে?—এ যে বিষম ব্যাধি বুঝেছিস?"

"আমারও একদিন দিদিমণি শেখানর লোক ছিল—তবে আমি শেখাতেম কি শেখাত সেইটেই এখনও বুঝতে পারছি না।"

শুভা হাসতে হাসতে বল্‌ল,—"আমি ত বেশ বুঝতে পারছি তিনিই শেখানর কর্ত্তা, আর আমাকে সুধু শিখেই যেতে হবে। কৈ বরাতের দোষে তাওত জুটছে না।

চপলা একটু গম্ভীর হয়ে বলে উঠল,—"জুটবে কি! যেমন তোমার ভাগ্য—তুমি অনাদরের পরিবর্ত্তে সুধু আদর দিচ্ছ ঘৃণার পরিবর্ত্তে ভালবেসে দিচ্ছ তোমার ভাগ্যে এর চেয়ে আর বেশী কি জুটবে?

"তবে কি করতে হবে বলনা।" শুভা অভিমানের স্বরে বলে উঠল।

"পার্ব্বে দিদিমণি, না তুমি সে জিনিযে তৈয়ারী নও। কান্নাই তোমাকে সম্বল করতে হবে। তা আর তোমার ঘুচছেনা।"

শুভা অন্যরূপ না ভাবতে পেরে বলে উঠল "না কেঁদে কি করি বলত?"

না ভেবেই চপলা বল্‌ল—"কড়া রাশ—পারবে—কখনও ঢিল দেবে না? তা হলে এই পুরুষ গুলো মাথায় চেপে বসবে। এরাও এক রকম জন্তু বিশেষ। সুপথে আপনি চলতে শেখে না।

"কি যে বলিস তোর মাথার ঠিক নেই" শুভা বলল।

মাথার ঠিক আমার দিদিমণি খুবই আছে। দেখনা জগতে মায়া মমতা স্নেহ এরাই না, আর সবচেয়ে বেশী এই ভালবাসাটাই আমাদের মাথাটার দফা রফা করে। তা আমার ত আর ও আপদ বালাই নেই।"

"নেই বুঝি" শুভা আবদারের সুরে বল্‌ল—

"ভূতের মত ঘাড়ে আর চেপে বসে নাই, তাই ভাবতে পারছি—"

"কি পারছিস?"

"পুরুষগুলো কি বোকা দিন রাত খাটবে। আমাদের সাজাবে, সাধবে। চাকরের চেয়েও আমাদের কাছে অধম হয়ে থাকবে।"

শুভা গর্ব্ব স্বরে বলে উঠল,—"আমারটী বাদ দিয়ে কিন্তু"

"ওতেইত তুমি মরেছ। কড়ারাশ মেয়ে গুলার কাছে যেমন পুরুষগুলো চাকর হয়ে থাকে তেমান আবার কড়ারাশ পুরুষগুলোর কাছে মেয়েরাই চাকর হয়ে পড়ে। কি বিধির কৌশল দিদিমণি?" বলে দাসী শুভার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

শুভা ভেবে ভেবে আস্তে আস্তে বলতে লাগল,—"তা হলেই বা কি—আমি তা হতে পারব না। তাতে আমার দরকারও নেই।"

কথাগুলো একদম জলে গেল দেখে দাসী একটু জোরে বলে উঠল

"তুমি না পার ; যে পারবে আমি ঠিক বলছি সেই দাদামণিকে হাত করবে। আর এর ভিতর আর কোন মুখ মাঝে মাঝে উঁকি মারছে কি না আমি ঠিক বলতে পারছি না।"

শুভা চমকে উঠল, বল্‌ল "কি যে বলিস ?"

"কি বলব, তোমার ঢের নুণ খেয়েছি। আমি সে লোকই নই যদি দাদামণির এ ব্যাধি খুঁজে না বার করতে পারি। আর তুমি সহায় হও ত চাই কি রোগটার ঠিক ঔষধ দিয়ে সারিয়েও দিতে পারি।"

শুভার মনে এরূপ ভাব জাগতেই পারত না। সে হাসি মুখেই বলল,—

"তুই একলা পারবি না ?"

"পারব না আর কেন ? আমি কি না পারি কিন্তু তা হলে দিদি-মণির চোখে এখন এক ধারা বইছে তখন দুধারা বইবে।"

"তা হলেও ত বাড়ী থাকবে বাইরে যাবে না ?"

"তা বলতে পারি না তবে স্বামীর ভাগ দিদিমণি কেউ দিতে পারে না যে যত মুখে বড়াই করুক না কেন।"

এ কথার সত্যতা শুভা মনে মনে বেশ বুঝছিল। মুখের পর একটা ভাবনার ছায়া আস্তে আস্তে এসে পড়তে লাগল। চপলা ও সরে গেল।

———

[৫]

শুভার শ্বাশুড়ী আজ অনেকবার গল্পচ্ছলে জানিয়ে দিয়েছিলেন এ মাদুলী কত আশ্চর্য্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছে এবং আভাষ ইঙ্গিতে বার বার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন যেন বৌমা ছেলেকে মাপ করেন। তা'র মতে ক্ষিতীশের ত ছেলেমানুষী করবার বয়স যায় নি।

আজ থেকে তারা দুটীতে সুখে থাকুক—এ আশীর্ব্বাদ অন্ততঃ কতবার যে মনে মনে করলেন তার ইয়ত্তাও ছিল না।

মাদুলির পর মায়ের অদম্যবিশ্বাস শুভার মনেও কিছু আশার সঞ্চার করে দিল। সে মনে ভাবল হতেওত পারে। মায়ের মুখ থেকে জোরের সহিত সে আজ অনেক কথা শুনেছে। কিন্তু সে এত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীর দেখা না পেয়ে স্বামীর মুখখানা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্ষিতীশ অনেক রাতে বিবাহিতা স্ত্রীর পার্শ্বে এসে শুয়ে পড়ল কিন্তু হতভাগ্য যুবক যে রূপের মোহ একবার হৃদয়ে জাগতে দিয়েছে তাকে ত রোধ করতে পারল না। দুজনার বাহ্যিক রূপের তুলনা তা'র হৃদয়ে ঝড় তুলে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্ল।

যাকে পাওয়া গেছে তার মূল্য চিরদিনই লোকে ভুলে যেতে চায়। অবোধ ক্ষিতীশও বাহ্যিক চাকচিক্যে পার্শ্বে শায়িতা সাধ্বী স্ত্রীর সরল

প্রাণের মূল্য না বুঝে মনে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ভুগতে লাগ্‌ল। ঘুম এল কিন্তু চিন্তাহীন সরল প্রাণের শ্রান্তি দূর করবার মত আনন্দদায়িনী বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ক্ষিতীশবাবুর দোর খোলার সঙ্গে জেগে উঠে ঘুমের ঘোর কেটে জেতেই শুভা বুঝতে পারল ক্ষিতীশবাবু বাহিরে যাচ্চেন।

এত রাত্রে তাঁকে একলা রেখে কোথায় যাবেন। সেই বা একলা কিরূপে থাকবে।

যে পবিত্র সম্বন্ধে সে তাঁ'রই পার্শ্বে বিছানায় নির্ভীকা হয়ে শুয়ে আছে সে পবিত্র সম্বন্ধের জোর তার মনের ভিতর তখন সব জায়গা জুড়ে রয়েছে। শুভা বলল "ঢের রাত রয়েছে। কোথায় যাও? বাতাস করব, গরম লাগছে?"

ক্ষিতীশবাবুর যে মনের গরম তখন বাহিরের গরম থেকে ঢের বেশী। কথা শুনেই রাগ ভাবে বললেন,—"বাতাস করতে হবেনা বরং পারত যার কাছে যাও, আমাকে ঘুমুতে দাও। এতক্ষণ ত ঘুমুতে পারলুম না।"

শুভার মন অপমানের বোঝা আর সইতে পারছিল না ভাগ্যি তখন কেউ সামনে ছিল না তা হলে যে তাকে মাথা খুঁড়ে মরতে হত।

তা'র ইচ্ছা হচ্চিল একে ঘুমুতে দিই; সামনে থেকে চলেই যাই। কিন্তু মায়ের মনের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রাণে আর আঘাত দেবার মত মনের অবস্থা সে করতে পারল না। যত পারুন তাকে

আঘাত করুন সে সইবে। বরাতের দোষে তা না সয়ে আর উপায়ই বা কি আছে?

শুভা চুপ করে আছে দেখে তার আঘাতে কোন ফল হচ্চেনা দেখে ক্ষিতীশবাবু পাগলের মত আরও জোরে বলে উঠলেন "যাবেনা? আমার কথা শুনবে না?"

শুভা কথার কোন মানেই বুঝতে পারল না। বৌকে গভীর রাতে ঘর থেকে বাহির হতে বলছেন। কোন সম্বন্ধ স্বীকার করতে চান না অথচ কথা শুনছে না বলে স্বামীর দাবী নিয়ে অনুযোগ করতেও ছাড়ছেন না। সেও আস্তে আস্তে বলল,—"কি যে বল ঠিক নাই। এত রাতে আমি কোথায় যাব?"

"কেন মার কাছে যেতে পার না"

শুভা বলল,—"কিন্তু তাঁ'কেও কি রাতে একটু শান্তিতে ঘুমুতে দেবে না। দিন রাত ত তাকে জ্বালাচ্ছ।"

ক্ষিতীশবাবু রাগের মাথায় বলে উঠলেন,—"কিসে জ্বালাচ্ছি শুনতে চাই?"

এর উত্তর শুভার মুখের কাছে এসে বেঁধে গেল। প্রকারান্তরে নিজের কথায় নিজের ওকালতি যে তাকে করতে হয়। কথায় কথায় নির্জ্জন রাতে কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে বুঝতে পেরেই লজ্জা এসে পড়ল।

ক্ষিতীশবাবুর তখন মাথায় খেয়াল চেপেছে। একটা রূপের মোহে নূতনত্বের আকর্ষণে পুরাতনের দিকে ফিরেও চাইতে পারছেন

না। যৌবনের নব উন্মেষণে নব প্রেম-বিহ্বল হৃদয়ে কে কোথায় তার ইষ্ট, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখতে পায়! নূতন চোখ, নূতন হৃদয় তখন নূতনের দিকেই ঢলে পড়তে চায়। পুরাতন সে তার পুরাতনত্ব নিয়ে শত চেষ্টা করলেও কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তবে তাকেও সময়ের সঙ্গে নূতন সাজে সাজতে হবে নূতন ভাবে নূতন মোহে মোহিত করে চলতে হবে। শুভা তা পারলনা।

ক্ষিতীশবাবু আরও রেগে উঠে বললেন—"দুজনে এক ঘরে থাকতে পারবনা এখন তুমি যাবে কি আমাকে যেতে হবে শুনি ?"

শুভা আর সহ্য করতে পারল না। এত অপমান এত অনাদর বড় আপনার জন স্বামীর কাছ থেকে কে কোথায় সহ্য করতে পারে? স্বামীই যে তার একমাত্র গতি; তাঁ'র কোলেই তার চিরজীবনের আসন পাতা রয়েছে। কেঁদে ফেলল বিছানার পরে ঢলে পড়ল।

ক্ষিতীশবাবু একটুখানি কপাট ধরে চুপ করে দাঁড়ালেন মুহূর্ত্তের তরে গতি রোধ হল—

মনও পশ্চাৎগামী হয়ে অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। সামনে তখন বহুদূরে অনন্ত আকাশে দশমীর চাঁদ অস্ত যাচ্চে। নীল বৃহৎ চাদরে ঢাকা দুই একটা তারকা মিটমিট করে জলছে। আর মন শুধু অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে আসছে। এ হাস্যময়ী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণিমা যামিনীরও ঘোর অন্ধকারময় অমানিশার রজনীর মধ্যবর্ত্তিনী অবস্থা দুই মনে করাতে পারে। ক্ষিতীশের মন মুহূর্ত্তের জন্য দোলায়-মান হল—

কিন্তু আপাততঃ মধুর তীব্র রূপের নেশায় উন্মত্ত যুবকের মনে এভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। অথচ তখন আর শুভাকে ব্যথা দিতেও ইচ্ছা ক'রছিল না। শুভা সামনে নিয়ে স্বামীকে আস্তে অতি সন্তর্পণে বাহিরে যেতে দেখতে পেল।

মনের ক্ষোভে আর না বলে পারল না যদিও তখন তার স্বর বড়ই কাতর; তাতে বুঝি পাষাণও গলে যায়।

"দাঁড়াও তোমার ঘর তুমি বাহিরে যাবে কেন? অসুখ কোরবে। আমি যাই আমার এখানে কি জোর আছে? তুমি যদি পায় রাখ আমি থাকৃতে পাব; নতুবা যেখানে যেতে বলবে যেতে হবে।

"না মনে কষ্ট পাবেন বলেই এতক্ষণ যাইনি।" শুভার কথা তখন চোখের জলের সঙ্গে বেরুচ্ছিল। "কিন্তু তুমি যখন তার ছেলে হয়ে বুঝলে না, তখন আমি তাঁ'র কাছেই যাই।"

এত রাতে শুভাকে কাছে দেখেই শুভার শ্বাশুড়ী আশ্চর্য্য হলেন তিনি যে কত সাধ করে বৌকে সন্ন্যাসীর মাদুলি পরিয়ে দিয়ে একান্ত মনে দেবতার মানত করেছেন। বৌটারই বুদ্ধি নেই।

রেগে উঠে বল্লেন,—"কি বৌমা তোমার কি বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে? একটু কিছু বল্লেই ঘর ছেড়ে আসতে হয়? যাও ঘরে যাও।

শুভা প্রমাদ গুনল এরূপ একটা ঘটনা ঘটবে সে তখন অতি দুঃখের সময়ে ঠিক করতে পারে নি। এখন যে তার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

বৌমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ক্ষিতীশবাবুর মা বড় দুঃখের

সহিতই বলে উঠলেন—বরাতে আমার আর সুখ নেই সংসার করা ফুরিয়ে গেল।

"ছেলে কোলে বিধবা হলুম ভেবে ছিলাম ছেলের বে দিয়ে তাদের সংসার পাতব ; তা বরাতে সইল না। আরও এমন অনেক কথা কইতে লাগলেন—যাতে শুভার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

মা, বৌ কাঁদছে টের পেয়েই উঠে বসলেন "চল দেখি কে তোমায় আজ নিজের ঘর থেকে তাড়াবে আর যদি কথাই না শোনেত কালই কাশী যাব। যা ইচ্ছে করুক গে আমি ত আর দেখতে আসব না।"

শুভা চলে যেতেই ক্ষিতীশ বাবু ভাববার সময় পেলেন। রাগ পড়ে এল। রাগের মাথায় কাজটা ঠিক হয়নি কোথায় যেন বুঝতে লাগলেন।

ছোট কালে পিতৃহীন হলেও এবং মায়ের একমাত্র পুত্র হলেও তিনি মাকে ভয় ভক্তি করতেন, এতে মায়ের কত বুকে বাজবে কত আশা করে বে, দিয়েছেন একটু একটু করে বুঝতে লাগলেন। এখানে থাকলে এমনই বা কি হত মায়ের রাগ করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ হয়েছে বুঝতে পারলেন।

মা শুভাকে সঙ্গে আসতে আজ্ঞা করতেই শুভা বলে উঠল "না মা, আর কতটুকুই বা রাত আছে। তোমার পা টিপে দি—

বাস্তবিক শুভার মনে জাগছিল এত ঢলাঢলি হচ্চে কি জন্য। একটা পেট, তার সংস্থান তার হইবেই। তবে স্বামী, তাকি এত বড়

জিনিষ যে না হলে চলে না। যার জন্য অভিমান আবদার সব জলাঞ্জলি দিতে হবে, শুধু খোসামোদ আর দাসী বৃত্তিই সার করতে হবে।

মনে বড়ই সন্দেহ হচ্ছিল 'এ কিছুতেই সত্যকার জিনিষ নয়, এ মিথ্যার আবরণে ঢাকা, নিশ্চয়ই এ কোন পুরুষের তৈরী নিয়ম।

কেন বে' করেছিলেন। যখন বে' করেছেন তখন সে নিয়ম তাকে মেনে চলতেই হবে।

আমার দোষ থাকে শাস্তি দিন—শিক্ষা দিন ; মাথা হেট করে সে শিক্ষা—সে শাস্তি মেনে নেব।

কিন্তু তাকে স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার স্বামী, তার সমান সম্ভ্রম-সম্মান আমার প্রাপ্য, তার অৰ্দ্ধেকে আমিই অধিকারিণী—

তিনি যদি তা না মানেন, সবল হয়ে আমায় ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন, তবে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোক হলেও আমিই বা কেন তার খোসামোদ করে নিলর্জ্জ হ'য়ে যেচে ভালবাসা নিতে যাব—না, আজ অন্ততঃ যাব না।'

শুভা বুঝল না, এ কথাটা তার মনে আজ সত্যের আবরণ নিয়ে ফুটে উঠলেও যতক্ষণ না বেশী সংখ্যার মত হয়ে দাঁড়াচ্চে ততক্ষণ এ মতে কোন কাজ হতে পারে না। বিক্ষিপ্ত দুই এক জনার চেষ্টা শুধু বিদ্রোহীর আসন পায়। তাও সামাজিক শাসনের দরুণ আকড়ে ধরে রাখা যায় না।

হেসে খেলে কাটাতে পারলে অনেক স্বাভাবিক ন্যায্য অধিকারের

কথা মনে আসে না কিন্তু যখনই সবলের কঠিন অত্যাচারে দুর্ব্বল কেঁদে উঠে—তখনই দুর্ব্বলের মনে জাগে নিজের ন্যায্য দাবির কথা—প্রকৃতি দত্ত অধিকারের কথা। তখনই তার সমস্ত শক্তির জোরে দাঁড়িয়ে উঠতে ইচ্ছা হয়।

পা টিপে দেওয়ার কথায় শ্বাশুড়ীর মন বৌ এর পর নরম হ'য়ে এল কিন্তু একা ছেলে রয়েছে। ওরা, রাগের মাথায় বৌকে ঘর থেকে তাড়ায় আবার একা থাকতেও ভালবাসে না—মনে পড়ল; বললেন, "না মা, পা টিপতে হবে না। যাও মা, ঘরে যাও শোওগে"—

শুভা চুপ করে রইল—এই প্রথম দিন শুভা মায়ের কথায় উঠল না। মা আর একবার অনুরোধ করতেই শুভা জোরে জোরে পা টিপতে টিপতে অতি কাতর ভাবে ভাঙ্গা গলায় বল্‌ল—"মা তোমার পা একটু আজ টিপে দি।"

ক্ষিতীশের মা বুঝতে পারলেন কত বড় আঘাত বৌমা পেয়েছে। নতুবা এমন ব্যবহার তিনি ত তার কাছে কখন পান্‌নি—শুভাকে তিনি চিনতেন। মেয়েরা মেয়েদের কাছে শীঘ্রই ধরা পড়ে।

নারীত্বের অপমান আজ নারী ক্ষমা করতে পারল না। তা'র নারী হৃদয় আজ মাতৃস্নেহ ঢেকে রেখে বৌর প্রতি সমবেদনায় ভরে এল। তিনি চুপ করলেন; শুভাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়াতে লাগলেন।

শুভা চোখ বুজতেই ক্ষিতীশবাবুর মা একাই ক্ষিতীশবাবুর ঘরে গেলেন। তিনি দেখলেন ছেলে তখনও দরজার কাছেই চুপ করে

বসে আছে। মাকে দেখে তাড়াতাড়ি ক্ষিতীশ পথ ছেড়ে দিল, মা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন—

"ক্ষিতীশ, বৌকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্ কেন? সে যে আমার কুললক্ষ্মী ; এ ঘরে তোর ও তার সমান অধিকার।"

মাকে আসতে দেখেই ক্ষিতীশের লজ্জা হচ্ছিল। এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে এমন একটা কাজ করে বসেছে যে মাকে পর্য্যন্ত এতক্ষণ ঘুমুতে দেয়নি। অনুতাপে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল, কোন কথাই বলল না। ছেলের মুখের উত্তর পেলে মা কতকটা শান্তি পেতেন। সে দোষ স্বীকার করলে এখানে এঘটনার যবনিকা পড়ত কিন্তু ক্ষিতীশের দুর্ভাগ্য সে তা পারল না। মার মনও ছেলে ও সংসারের ভবিষ্যৎ ভেবে অগ্নিদগ্ধ হতে লাগল। তারই সামনেত তারই ছেলে অমন মানী পরিবারের মেয়ে নলিনের বোনকে এতবড় অপমান করতে সাহস ক'রল!

তা'র তখন শুধুই ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্ত্তে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে এ সংসার—যেখানে বৌয়ের মান মর্য্যাদা থাকছে না,—ত্যাগ করে যাই।

কিন্তু ক্ষিতীশ তার একমাত্র ছেলে, কি ভীষণ আঘাত তার লাগতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে ক্ষিতীশকে বোঝাতে নিজের কথা পরিষ্কার করে বলে যাবার জন্য তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—

"ক্ষিতীশ তুই কি বুঝবি। আমি কেন এ বৌকে আহ্লাদের সহিত বরণ করে এনেছি। মাঝে মাঝে চুপ করে শুনি, বৌমা

কালো। কটা রং দিয়ে কি হয় বাবা? অমন মুখশ্রী একখানা কখনও দেখেছিস? আর মেয়েদের রূপ, সেত দুদিনেই চলে যায়— তাই বে'র সময় শুধু রূপ দেখলে হয় না। দেখতে হবে বংশ। শুভা নলিনের বোন। যদি সে নলিনের হৃদয়ের এক কণাও পেয়ে থাকে ত বলব সারা জগৎ ঘুরে অমন কুললক্ষ্মী আমি পাব না—পেতাম না।"

ক্ষিতীশ নির্ব্বাক হ'য়ে বিছানায় শুয়ে শুধু বাহিরের দিকে চেয়েই আছে। তার মনের ভিতর একটা ঝড় বচ্ছিল। মাও কিন্তু সহজে মুখ খুলতেন না, একবার খুললে যতরূপে পারেন, না বুঝিয়ে ছাড়তেন না। ক্রমে ভাবের আধিক্যে স্বর উচু হতে লাগল—

"যদি শুনতে চাও,—শোন বাবা, কেন আমি এ বে'তে এত আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। এ দু পরিবারের ঝগড়া বিবাদে দু পরিবার উচ্ছন্ন যেতে বসেছিল। কর্ত্তাকে দেখিছি কত রাত না ঘুমিয়ে সারারাত পায়চারি করে বেড়িয়েছেন। নিজের জীবন আমার সামনে তিল তিল করে ধ্বংস করেছেন। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিছুতেই থামাতে পারিনি। কোথায় রইল বাবা বিষয় সম্পত্তি! আর এই দুই পার্শ্বস্থ নিরীহ শান্তিপূর্ণ প্রজাদের কি জ্বালাতনই না হত। উঃ! সে কি অত্যাচার! আজ এর ঘর পুড়ল ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলায় আশ্রয় নিতে হ'ল, কেউ বা বিষম আহত হয়ে শু'য়ে পড়ল, খেটে খেতে পারল না! বাবা, মনে ভাব দেখি তারাও আমার প্রজা, আমার ছেলে!

যে দিন কালিয়ার চরে খুন ক'রে এসে গোবর্দ্ধন নূতন হাঁড়ি চাইল

তখন তুমি আমার কোলে—আমার মন কেমন করে উঠেছিল ভাবতে। কত মানত করেছিলাম তাই বুঝি তোকে আজও ধরে রাখতে পেরেছি।

তাই বাবা, যেই এ ঝগড়া ও অত্যাচার নিবারণের পথ পেলাম তাকেই আকড়ে ধরলেম। এ সংসারে আর এখন কিসের অশান্তি! বড় আশা করেছিলাম একটা মস্ত কাজ জীবনে তোকে দিয়ে করতে পেলাম। চির অশান্তিময় গ্রামে শান্তি আনতে পেলাম। তাকে তুই মলিন হতে দিস না বাবা" বলে বড় আশায় ছেলের পানে চেয়ে দেখলেন ছেলে চুপ করে আছে—তিনি বড়ই ক্ষোভের সহিত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

মায়ের কথায় ক্ষিতীশের উত্তর যোগাচ্ছিল না, ন্যায় অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব মনের ভিতর তোলপাড় করছিল।

রাতে শ্রান্তি দূর করতে আরামদায়িনী নিদ্রার কোলে জীব গা ঢেলে দেয়। প্রভাতে আবার নব জীবনের উৎসাহ নিয়ে নূতন কাজে সমস্ত দিন ছুটে চলে। পাখীর কূজন, নব অরুণোদয় সে নূতনত্বেরই আহ্বান করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ মা ও ছেলে নানা চিন্তা নিয়েই রাত কাটাইলেন। ঘুমও চোখে এল না।

তাই সকাল হলেও আজ কেউ নূতনত্বের আস্বাদ পেলেন না—নব প্রভাতের শান্তিতে মন ভরে উঠল না। বিষম উদ্বিগ্ন মনে অসীম চিন্তার সঙ্গে ছেলে বাহিরের ঘরে এল।

---

[৬]

চপলা রোজ সকালে ক্ষিতীশবাবুর চা দিয়ে যেত, আজও সে চা হাতে করে হেলতে দুলতে ঘরে ঢুকল। কিন্তু বাবুর মুখপানে তাকিয়ে চমকে উঠল। রঙ্গরস নিয়ে নিষ্পাপ জীবন সে এতকাল কাটিয়েছে।

ভয় ভাবনা তা'র কিসের। দাসী হলেও সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার পে'ত, নলিনবাবুদের বাড়ীর লোক সে। সে বাড়ীতে চাকর মনিবের সম্বন্ধ বড়ই মধুর, বড়ই প্রীতি-প্রদ ছিল।

এই সম্বন্ধের উপর সংসারের কত খানি শান্তি যে নির্ভর করে নলিন বাবুই জানতেন। তাই তিনি সম্বন্ধটাকে রক্তের সম্বন্ধের সমান করে তুলেছিলেন।

চপলা শুভাকে বড়ই ভালবাসত। মায়ের পেটের বোনও বোধ হয় তার চেয়ে শুভাকে বেশী ভালবাসতে পারত না।

শুভাও চপলার রাগ, মান, অভিমান, আবদার, শাসন ঠিক ছোট বোনের মত সহ্য করত। সে যে তাকে আপনার দিদি বলেই জানত।

বোনের বরের মুখের ভাবে চপলা নিজেকে সামলাতে পারল না—অস্বাভাবিক স্বরে বলে উঠল,—"ও কি আপনার মুখ আজ অমন ফ্যাকাসে কেন? অসুখ করেছে?"

কি উত্তর দিবেন ক্ষিতীশবাবু। নিঃস্বার্থ আগ্রহের নিকট মিথ্যা চলে না। মন যদি দেখবার কোন উপায় থাকত তাহলেই ঠিক জানা যেত, মানবমনের স্বরূপ কি, মনের অতল সর্ব্বনিম্নস্তরে কি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এ যায়গা খুব সাবধানে ঢাকা আছে। এই জায়গায়ই মানুষ ও পশু সমান, কত অসৎ চিন্তা যে মনের ভিতর সদাই ঘুরে বেড়ায়, বলা যায় না। ঐ সব চিন্তাই বুকে আঁকড়ে ধরে অনেক লোকেই স্বার্থহীন সংযমী প্রভৃতি বড় বড় আখ্যা শিরে ব'য়ে বেড়াতে সক্ষম।

ক্ষিতীশবাবু দাসীর কথার কি উত্তর দেবেন। নিজের মনকেই তখন তিনি বুঝতে পারেন নি। মনের আগ্রহ, মনের তৃপ্তি, মনের শান্তি কিসে আসে জানা বড়ই কঠিন। অনেক দিন ধরে জানবার চেষ্টা করেও ইহা অনেকে জানতে পারেন নি।

তাই কেউ কঠোর সংযমআশ্রয়ে ভীষণ তপস্যায় হিংস্র পশু-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, কেউবা নগরীর কোলাহলের ভিতর সুরম্য অট্টালিকায় শুয়ে চিন্তা করছেন। বুঝতে না পেরে দুজনার মনের আকাঙ্ক্ষা এত বিভিন্ন হয়ে পড়েছে।

ক্ষিতীশবাবুর মন থেকে আজও শুভার স্মৃতি একেবারে মুছে যায়নি। একখানি দলিতা ব্যথিতা হিন্দুস্ত্রীর নিঃস্বার্থ অসংশয় ভাবে আত্মসমর্পণের ক্ষীণ আবছায়া রয়েছে। অথচ অপর একখানা সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি তা'র নব যৌবনের প্রথম উন্মেষণার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে জেগে উঠছে। এতে যে উন্মাদনা আছে তা'তে ঐ ক্ষীণ ছায়া

বুঝি ঢেকে যায়। বল্‌লেন—"না চপলা, অসুখ করেনি, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি।"

এ কথার উত্তর দিয়ে কথা বাড়াতে গেলে যে কি কথা আসতে পারে, আর দিদি হয়ে তা এখন তার মুখে মানায় না বুঝে চপলা বলল—"শীঘ্র স্নান সেরে নিন। একটু ডাবের জল খান। সকাল সকাল দুটি খেয়ে নিয়ে একটু ঘুমুতে পারলেই সেরে যাবে।" বলেই রান্না ঘরে ছুটে গেল। বামুনমেয়েকে তাড়াতাড়ি করবার জন্য তার পিছনে লাগল।

ক্ষিতীশবাবু প্রভাত সমীরণে একটু হাল্কা হতে একা বেড়াতে বেরুলেন; কিন্তু যেয়ে বসলেন সুরেনের বাড়ীতে। সুরেন বাড়ীতে ছিল না। অথচ সে বাড়ী ছেড়ে আসতেও পারছেন না; পা আটকাচ্ছে। অনেক ইতস্ততঃ করে বাহিরের ঘরে বসলেন। শৈলজাও দেখতে পেয়ে আড়াল থেকে জোরে চারুকে বলল—"ঠাকুরপোকে দয়া করে একটু বসতে বল; চা করে দিচ্ছি।"

ক্ষিতীবাবু সব শুনতে পেলেন—চেপেই বসলেন।

সামনে আস্তে কথা বলতে লজ্জা হয় মুখ ভেঙে পড়ে অথচ একটা চিকের আড়ালে কিংবা পরদার আড়াল দিয়ে স্বর্গ মর্ত্ত চেঁচিয়ে রসাতল করা যায়।

মেয়েদের এ ভাবের জন্য পুরুষেরাই দোষী। মেয়েদের রূপকে খুব ছোট ভাবতে না পারলে—ভোগের সামগ্রী মনে করতে না পারলে এরূপ হয় না। ভুলে যাই তারা শক্তি-স্বরূপিণী ভবিষ্যৎ বংশধরের

গর্ভধারিণী মাতা। মেয়েদের রূপ যে কেবল মাতৃমূর্ত্তিতেই উজ্জ্বল—ফলপুষ্প-শোভিতা বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্য জানিয়ে দিয়ে যায়।

শৈল নিজ হস্তে যতদূর সম্ভব যত্নে চা তৈরী করে চারুকে দিয়ে আসতে বল্‌ল। "দেখিস যেন কালকের মত দরজার কাছে ফেলে দিয়ে আসিস নে।"

চারু ত ইচ্ছা করে ছুটে পালায়নি, না পালিয়ে সে পারেনি। যেরূপ ভাবে উনি চেয়ে রইলেন—বালিকা সহ্য করিতে পারেনি। নিজের কথা বাদ দিলেও তিনি চলে গিয়েছেন; তাঁ'র মান মর্য্যাদা আজ তাতেই ন্যস্ত রয়েছে! এ দেহ মন তাঁ'রই খেলার সামগ্রী, তাঁ'রই আনন্দের জিনিষ ছিল। এ রূপের দিকে সে শুধু একজনকেই পবিত্র ভাবে স্বর্গীয় মাধুরী নিয়ে চেয়ে থাকতে দিয়েছে। তিনি আজ কোথায়? কাছে না থাকুন। সেই দেব-ভোগ্য জিনিষের প্রতি অপরিচিতেরা এমন ভাবে তাকায় যে বালিকা সহ্য করতে পারে না। চোখে জল আসত, তাই সে কোন পুরুষেরই সামনে আসতে পারত না। আসতে হলেও ছুটে পালাতে হত। শুধু যে তাঁরই স্মৃতি, তার মন জুড়ে রয়েছে তাঁ'র জীবনের খুটিনাটী ব্যাপার মনের ভিতর নাড়া চাড়া করে সব সময়ে সে মজে থাকত।

কাকীমার অজস্র গালাগালি অসংখ্য অত্যাচার সে এই স্মৃতির অবলম্বনেই ভুলে থাকৃত। আর যে তার কোনই অবলম্বন ছিল না। মুখ বুজে কাকীমার আজ্ঞা পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

চায়ের বাটী হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পিছন চেয়ে দেখল, কাকীমা তাঁর দুটা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চারুর আর পা চলে না। মন চল্‌ছে না—তার হাত পা চলবে কি? তার ক্রিয়া যে সব থেমে যাওয়ার মত হয়ে পড়েছে। বুকের স্পন্দনও বুঝি থেমে যায়!

চুপ করে থাকতে দেখে শৈলজা রেগে উঠে বল্‌ল—"ছুঁড়ীটার ব্যাপার দেখে বাঁচি না। এদিকে চা নিজের হাতে দিতে আসবার ষোল আনা ইচ্ছে আছে অথচ সামনে এসে দরজায় মুখ ভেঙে পড়ছে।"

কথাটা সম্পূর্ণ ক্ষিতীশবাবুর কাণে গিয়ে তার উন্মত্ত মনকে যা বোঝাবার বেশ করে বুঝিয়ে দিলে। ক্ষিতীশবাবুর ইচ্ছা হল চেচিয়ে বলেন ঐ খানেই থাক, আমি নিজে নিয়ে আসছি, কিন্তু মুখ দিয়ে কথাটা বেরুল না।

একটু দেরী হচ্ছে দেখে ভাবলেন, হয়ত তাকে আবার আমার জন্যে কত কথা শুনতে হবে। মাথা ঠিক থাকল না। আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। চারুও আর সহ্য করতে পারছিল না। যে কথা আজ কাকীমার মুখ থেকে বেরুল এর পরে সে কিরূপে এখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু পালালে আশ্রয় কোথায়! অপমান সহ্য করতে না পেরে পা কাঁপতে লাগল। বুক দুর দুর করে উঠল আর বুঝি দাঁড়াতে পারে না।

হঠাৎ সুরেন এসে পড়ল। চারুও কোন চিন্তা না করেই ছুটে পালাল।

সুরেন তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকতেই দৃশ্যটা দেখল, মনটা গুলিয়ে গেল। এর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না।

বাস্তবিক তিনটী প্রাণীতে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একটা অসম্ভব খাপছাড়া দৃশ্য তৈরী করেছিল। বাহিরের লোকের চক্ষে পড়লে যে তার কি মনে হত তখন তা'দের মাথায় সে খেয়াল ছিল না।

সুরেন ক্ষিতীশবাবুকে "আসছি" বলে ভিতরে ঢুকেই শৈলজাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল—"কি হচ্ছিল এখানে?"

শৈলজা অপ্রতিভ হবার পাত্রী নয়। নিরাশ্রয় আশ্রিতের ঘাড়ে যাদের দোষ চাপাতে মনে একটুও বাধে না, তারা কবেই বা অপ্রতিভ হয়ে থাকে। বলল,—"তোমার বড় আদরের বৌর কাজটা দেখ-ছিলাম।"

সুরেন এ কথাটা কাণে তুলল না। মনের গোলমাল কিন্তু গেল না। শৈলর কাছে চারুর কথা তুলতে তার ভারি আপত্তি ছিল। রাগের মাথায় বলে উঠল—"তুমি নিজে দিয়ে আসতে পারলে না।"

"আচ্ছা এবার থেকে ঠাকুরপোকে আমিই চা দিয়ে আসব। দেখ যেন পরে মনে কিছু কর না।"

সুরেন হাসিমুখে বলে উঠল,—"কবেই বা বারণ করেছি? আর এখন তোমার সে বয়সও নেই। বিশেষ ক্ষিতীশ আমাকে দাদার মত শ্রদ্ধা করে।" সুরেন শৈলকে চিনত, কথাটি এগুতে দিলে যে

তাকে অনেক অপ্রিয় কথা শুনতে হবে, হয়ত শোনাতেও হবে। তাই ঠাট্টা করে চাপা দিতে গেল।

শৈল কিন্তু বলে উঠল,—“ক্ষিতীশবাবুকে চা দিতে যাবার সময় আমায় কি বলে এসেছিল? না আমার আর কোনও কাজ নেই যে তোমার গুণের বৌটিকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখব? তা যদি করতে হয় ত বাড়ীর বাহির হয়ো না; বসে বৌ চৌকি দিও। আমি তা পারব না। আর সে অভ্যাসও আমার নেই।”

সুরেনের আর শোনবার ইচ্ছা হল না। আস্তে আস্তে চারুকে গিয়ে বলল,—“আমাকে এক গ্লাস চা দিবি না মা?”

চারু তখনও চা’র বাটী সামনে নিয়ে কত কি ভাবছিল। ধীরে ধীরে বাটীটি সরিয়ে দিল।

সুরেন বলল—“এ ত ক্ষিতীশবাবুর জন্য, আর নেই?”

“কাকীমা আমাকে এক বাটীই দিয়েছিলেন” বলে আর একটা খালি বাটী এগিয়ে দিয়ে চারু মুখ নত করল। সুরেন দু বাটীতে চা ঢেলে নিয়ে বাহিরে ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে গল্প করতে বসল।

---

[৭]

চপলা রাঁধুনীকে ভাত ঠিক করতে বলে দিয়ে বাহিরে বাবুর জন্য তেল নিয়ে গেল। ক্ষিতীশবাবুকে খুঁজে পেল না, তিনি বেরিয়ে গেছেন।

বাড়ীর ভিতর পৌছেই দেখল, শুভা ও মা এক যায়গায় শুষ্ক মুখে বসে আছেন। তাদের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র চমকে উঠল। একজন ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; আর একজনের মুখ এমন ফ্যাকাসে যেন সে মুখে জীবনের চিহ্ন নাই। কি এমন একরাত্তিরের ভিতর এ বাড়ীতে ঘটল যে সবার অবস্থা ভীষণ ঝড়ের পর গাছের মত করে গেল। অথচ সে বাড়ীতে থেকেও সে তা'র কিছুই জানল না; জিজ্ঞাসা করতেও সাহসে কুলাল না। মনে হতে লাগল কত আশা করে না নলিনদা শুভাকে দেখবার জন্য তাকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছেন!

যদি কোন বিপদ ঘটে কোন মুখ নিয়ে সে তার আশ্রয়দাতা প্রতিপালক দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! মন ঠিক করে নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই শুভাকে মার কাছ থেকে টেনে নিয়ে জোর করে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল।

শুভা দু'বার তিনবার তার মুখের দিকে তাকাল কোন আপত্তি করতে সে পারল না।

শুভার কাতর অথচ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখেই চপলা বেশ বুঝল সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু এখন ত তার শোনার সময় নেই সবাই শুষ্ক মুখে রয়েছে। সবাইকে খাওয়াতে হবে।

শুধু তার তখন ইচ্ছা করছিল মাথা খুড়ে মরি।

শুভাকে শীঘ্র স্নান সেরে নিতে বেশ কড়া স্বরে আজ্ঞা করল।

'এত বেলা হয়েছে, তোমার ক্ষিদে না থাকতে পারে কিন্তু আমার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। এসে যদি দেখি চুপ করে বসে আছ তা হলে এখানে আমার পোষাবে না' বলেই তাড়াতাড়ি মার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মার আজ আর কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। এত দুঃখ এত অশান্তি তার জীবনের শেষ দিনের জন্যও সঞ্চিত ছিল, এ তিনি কোন দিন ভাবতেই পারেননি।

মাই জানেন তিনি কত আশা মনে করে ছেলের বে দিয়ে বৌ ঘরে আনেন। দশ বৎসরের ছেলের জেঠাইমাকে দেখেছি তীর্থস্থান থেকে সেই ছেলের বৌর জন্য খেলনা কিনে নিয়ে সারা পথ কত যত্নে বুকে করে টেনে এনেছেন।

মায়ের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে চপলার কিছু কাল কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না। মার কাছে তার ভালবাসা ভক্তিতে দাঁড়ায়—আবদার শ্রদ্ধায় ডুবে যায়—সম্বন্ধ দেবত্বে পরিণত হয়। তবু আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে বলল,—"মা বেলা হয়েছে, তেল মাখিয়ে দি"।

কোন কথা না বলে মা একবার তার মুখের দিকে তাকালেন।

চপলা সে কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। পিছনের দিকে গিয়ে চোখ মুছতে লাগল। একটু খানি শান্ত হয়ে নিয়ে মাকে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল।

সরল শিশুর মত আবদারে, হাত ধরে যখন চপলা স্নান করতে মাকে আহ্বান করল, সাধ্য কি তখন তিনি সে ডাকের অপমান করতে পারেন। ছোট ছেলের মত যদি কেউ কচি মুখ নিয়ে মা ডাক ডাকতে পারে তখন কোন মাই ঠিক থাকতে পারেন না। মাটীর পুতুল হলেও তাকে ডাক শুনতে হয়!

দুজনাকে স্নান করতে পাঠিয়ে দিয়েই তার মনে ক্ষিতীশবাবুর কথা জেগে উঠল। তিনিত বাড়ীতে নেই। এতক্ষণ সে মা ও শুভার অবস্থায় সব ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তাকে না পেলে তার খাওয়া না হলে যে কেউ খাবে না—তার সব চেষ্টা বৃথা হবে। বরং স্নানের পর অশান্তি আরও জ্বলে উঠবে। ঝগড়ার পর যদি কোন মতে ঝগড়া মেটাতে যাই তখন যদি অপর পক্ষ আগ্রহ না দেখায়, অগ্রসর না হয় ত বিরোধ দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠে। আর তাহা নিবারণের উপায় থাকে না।

চপলা আর চুপ করে থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি বাবুর খোঁজে বাহিরে গেল।

রামচরণ পাইক বাহিরে বসে ছিল, চপলা তাকেই সামনে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—"বাবু কোথায় গেছেন জানিস?"

স্মৃতি-পূজা

রামচরণ অল্পদিনের চাকর। নবীন বয়স; কামান্ধ যুবক হিংস্র পশু থেকেও ভীষণ। অসংযমী সে কোন দিন রূপের পানে পবিত্র ভাবে চাইতে পারত না। মেয়ে জাতকে সে জানত ভোগের সামগ্রী। তাও দুদিনের জন্য নয়, শুধু একদিনের জন্য। এ সংসারে সবাই ভাল, সবাই সমান, এ কথা অনেকে নিজের মনের গুণে ভাবতে পারেন। মানব চরিত্র হীনপথে গেলে কত কুৎসিৎ কত ভীষণ আকার ধারণ করতে পারে বলতে গেলে তা তারা শুধু উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিতে চান। সত্যি যদি ইহা গাজাখুরী গল্প হত কিংবা কোন অদ্ভুত ঘটনার বলে সে সব চরিত্র অসম্ভব হয়ে উঠত তা হলে বোধ হয় সুখের হ'ত। কিন্তু এ যে নিজে দেখেছি। নিজের চোখকে—নিজের মনকে অবিশ্বাস করতে পারিনে।

রামচরণ চপলাকে দেখবার পর থেকে তার পর নেকনজর পড়েছিল। কার পর যে পড়ত না তা শুধু সেই জানত। আর তা'র চেহারা ও বয়স কল্পনা করে নিতে হয়—তা দেখতে পাওয়া যায় না। গোপনে মুচকে হেসে চপলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল "হাঁ জানি।"

"তবে যা শীঘ্র ডেকে আনগে ত; দেরি করিস না।"

রামচরণ জানত না যে তাকে ডাকতে যেতে হবে। সে শুধু দাসীর সঙ্গে আলাপ জমাতে একটা মিথ্যা উত্তর দিয়েছিল। সে ভেবেছিল দাসী তা'র সঙ্গে আলাপ করবার ছুতো খুঁজতেই তাকে এসে এ কথা জিজ্ঞাসা করছে।

যে কাঁচা বয়স ও যে রূপ, অপরের সঙ্গে আলাপ না করে থাকতে পারে না—রামচরণের মন বল্‌ল।

এ বয়সে এত রূপ নিয়ে সে ভাল থাকতে পারে রামচরণের ধারণায় আসত না। তাই সে বড় আশায় আলাপ জমাতে একটা যা কিছু উত্তর দিয়েছিল কিন্তু এখন হুকুম শুনবামাত্র একটু বিপদে পড়ে বল্‌ল—"যেরূপ ভাবে বাবু বেরিয়ে গেলেন—আমি কি ডাকতে যেতে পারি।"

চপলা বল্‌ল—"তিনি কি রাগেব মাথায় তোকে ডাকতে বারণ করে গেছেন ?"

রামচরণ একটা উপায় হাতের কাছে পাবা মাত্র বলে উঠল—"না গো আমি যেতে পারব না—যে রাগ বাবুর,—"

চপলার তখন কোন কিছু ভাববার সময় ছিল না। তার বোন ও মা না খেয়ে পথ পানে চেয়ে রয়েছে। সে কি চুপ করে থাকতে পারে! "তবে চল আমি ডেকে আনিগে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবি ত ?" জোরে বলেই মনে মনে বল্‌ল—"বরাতে আজ কত কি আছে জানি না। যাহোক আজ আমাকে একটা উপায় করতেই হবে।"

আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও বুঝি কেহ আজ রামচরণের চেয়ে আনন্দিত হ'ত না। কামের পুলকস্পন্দন সর্ব্বাঙ্গে মেখে নিয়ে লাঠি হাতে রামচরণ উঠল। চপলা পিছন পিছন চল্‌ল।

অল্পকাল স্থায়ী জিনিসের জোর বড় বেশী। কামান বড়ই জোরে

ছোটে। বিদ্যুৎ চোখ ঝলসে দেয়। অল্পকাল স্থায়ী কামের তাড়নায় রামাকে পাগল করে তুল্ল।

কামাতুর যুবা কামের পথে চলল। ভবিষ্যৎ ভাবল না। বাড়ীতে নিজের বলতে কেউ না থাকলেও যে তার একখানি ঘর আছে ; এ সব প্রকাশ হলে তাও ছেড়ে যেতে হবে একবারও বুঝল না। এমন রূপবতী যুবতী দাসীকে পিছন পিছন নিরাপত্তিতে আসতে দেখে তার বুকে সাহস বাড়ল।

নিজের ভাবনা নিয়ে মগ্ন থেকে চপলাও নিজের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারল না। জমিদারের বাড়ীর দাসী সে ; চিরদিন জমিদারের বাড়ীতেই কাটিয়েছে। মেয়েদের রূপ যে কত বড় শত্রু, পদে পদে কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে সে একদিনও জানতে পারেনি। তা'র গায়ে ত নলিন বাবু কোন দিন আঁচড় লাগতে দেননি। শুধু হেসে খেলেই কাটিয়েছে।

চপলার চমক ভাঙতেই নিজেকে বনের ভিতর ছোট একখানা ঘরের সামনে দেখতে পেল, জিজ্ঞাসা করল,—"রামচরণ এখানে বাবু আসবেন ?" রামচরণের তখন বুকে সাহস বেড়ে গেছে। এত দূর ত দাসী সঙ্গে এসেছে,—এখান থেকে ডাকলেও কেউ সাড়া দেবে না।

রামচরণ হেসে আটখানা হয়ে বল্ল,—"বাবুকে ত আর কুঁড়ে ঘরে পাওয়া যাবেই না। কিন্তু কারুর ত বাবু হওয়া যাবে। একটা কিছু মতলব না করে কি আর তোমার সঙ্গে এত দূর এলাম। লোকে দেখলে কি ভাবত !"

এতক্ষণ অন্তমনস্ক থেকে চপলা তার ভুল বুঝতে পারল। জোর-গলায় বলে উঠল—"দেখ ভাল চাও ত বাবুর কাছে নিয়ে চল। নইলে তোমার অশেষ দুর্গতি!"

হেসে উঠেই রামচরণ বল্‌ল,—"চোখ রাঙ্গাচ্ছ কেন? একটু পরে দুজনাই যাব। মেয়েদের চোখ রাঙানি আমি ঢের দেখেছি, ও দুদণ্ডের জন্য; একটু পরেই সব নিবে যায়।"

"যাবিনা?"—চপলা রাগে কেঁপে বল্‌ল—

রামচরণ বলল—"রাগ কর না সুন্দরী। তবে শোন বলি, এই যে ঘর দেখছ, এ আমার বন্ধু সখিচরণের মেয়ে মানুষ তরুর।

সখিচরণের বরাত ভাল। তরুর বয়স ও চেহারা দুই আছে। তারপর আমার বড়ই নজর পড়ল। কিছুতেই হাত করতে পারিনে—"

চপলা বুঝল, কত বড় পাষণ্ডের হাতে সে পড়েছে। জোর করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া কষ্ট হবে। সময় নেবার জন্য,—যদি তার ভাগ্যক্রমে কেউ এ পথে যায়, সেই আশায় গল্প শুনবার ভান করে চুপ করে রহিল। কাণে কিন্তু তখন বিষ ঢালছে।

রামা চপলাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাহস পেয়ে বলে যেতে লাগল,—

"শেষে সুবিধা খুঁজতে লাগলাম। সখিচরণ কুটুম বাড়ী গেল। আমিও দুপুর রাতে ধারাল দা হাতে করে এসে হাজির হলাম। অনেক সাধাসাধি করেও দরজা খোলাতে পারলুম না। তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে নিজমূর্ত্তি ধরে দা দিয়ে বেড়া কেটে ঘরে

ঢুকলাম, কিন্তু শেষে সেই তরুই আমার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেড়া বাঁধে। দরকার হলে রামচরণ কখনও পিছপাও হবে না জান ঠাকরুণ।”

চপলা বিষম বিপদে পড়ল, কাকুতি মিনতির ফল কি হয় দেখবার জন্য কাতরস্বরে বল্ল—“দেখ আমার স্বামীকে আমি বুকের ভিতর পুরে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এতে যে সে রাগ করবে। আর দেখা দেবে না।”

রামচরণ হেসে বল্ল,—“দূর পাগলি, মরা মানুষ—আবার বুকের ভিতর থাকে, সেত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।”

“না গো আমার বড় ভয় হচ্ছে, সে রাগ করবে।” চপলা অতি কাতরে বল্ল।

“প্রথম প্রথম ভয় হয়। শেষে দেখবি কত মজা। তখন আমার কথা মনে ভাববি।”

“রামচরণ, তোমার পাপের ভয় নেই ?”

“পাপের কি করছি যে ভয় করতে যাব। একদিন দু’দিনে কি পাপ হয়। যদিই বা হয় দুজনায় গঙ্গায় নেয়ে আসব। তা হলেই ত হল।”

চপলা প্রমাদ গণল। একটা ভীষণ কাজ করবার জন্য মনকে শক্ত করতে লাগল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ’য়ে সামনের বাঁশটার দিকে চাইল, কিন্তু দরকার হল না। ঠিক সেই সময়ে সখিচরণ তরুর সঙ্গে এসে হাজির।

সখিচরণ ভাব গতিক দেখে কতকটা ব্যাপার বুঝতে পারল। জিজ্ঞাসা করল,—“কিরে ব্যাপার কি ?”

রামচরণ বলল,—"একটা ভাল জিনিষ যোগাড় করেছি তা হাত হচ্ছে না। তুই যদি পারিস ত দেখনা ভাগ পাবি।"

"সাবধানে কথা বল রামচরণ" তরু জোর গলায় বলেই সখিচরণের দিকে ফিরল এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ল—"পোড়ার মুখো মিনসে সবার দিকে নজব না দিলে তোর ভাত হজম হয না।"

"আমি কি করেছি, ঐত বল্‌ছে, ওকে ত বল্‌তে পারছ না"—ভীত দৃষ্টিতে সখিচরণ বল্‌ল। সে তরুকে চিনত।

"ও আমার কে যে 'ওকে আমি শাসন করবো," তরুর মুখ দিয়া একথা বেরুতেই চপলা তরুর কাছে সরে গিযে বল্‌ল—"আমায পথটা দেখিয়ে দাও না—আমি জমিদাব বাড়ীতে থাকি।"

"এখানে এসেছিলে কেন বাছা," তরু রাগতস্বরে বল্‌ল। "এ ত ভাল মানুষের পথ নয়!"

তা'র বিরুদ্ধে এ অভিযোগের কোন উত্তর তখন তার নেই। যে উদ্দেশ্যের কথাই সে বলুক না—স্থান কাল পাত্র বিশেষে তা মানাবে না; সে তখন নিজেই তা বুঝতে পারছিল। তথাপি না বলে পারল না।

"সে অনেক কথা, মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। আমায় যেতে দেও; এত বেলা হল, সবাই না খেয়ে পথপানে চেয়ে রয়েছে" বলে পাগলের মত চলতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে রামচরণও সখিচরণকে জোরে বলে উঠল—"শীগ্‌গির চল্‌, এ অবস্থায় ওকে যেতে দিলে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমার মুখ দেখান ভার হবে। ওকে হাত না করে, ছাড়া চলে না। ও মেয়েটা এখনও ভাল আছে।"

ভাল মেয়েকে খারাপ করবে একথা শুনেই তরু তাদের আগে ছুটে যেয়ে চপলার হাত ধরল ও বল্‌ল—"চলত বোন আমিই তোমায় পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি।"

রামচরণও তাদের সামনে গিয়ে সখিচরণকে বল্‌ল "সখি—বারণ কর্ নতুবা আমায় জোর করতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গেই তরুও বলে উঠল—"দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? তোর সামনেও আমার গায় হাত তুলবে কি?"

"ছেড়ে না দিলে নিশ্চয় তুলব" রামচরণ জোর গলায় বলে উঠল। সখিচরণ গিয়ে রামচরণের জোরে হাত ধরল। মেয়েরা পথ পেল।

খোলা পথে পড়তেই তরু জিজ্ঞাসা করল,—"কোথায় যাবে বাছা? তোমায় ত ঘরে নেবে না।"

চপলা নির্ভয়ে বলে উঠল,—"কেন নেবেনা, কি দোষ করেছি আমি।"

অতীতের স্মৃতি মনে পড়তে তরুর চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল; ভাঙা গলায় বল্‌ল—"আমায় ত নেয় নি। কোন দোষ করিনি তবুও যারা আমার আত্মীয় স্বজন ছিল, আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। তবু আমি তখন নিষ্পাপ দেহ নিয়েই বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম। আশ্রয় পেলে আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।" তরুর মুখ ক্ষোভে লাল হয়ে উঠছিল।

চপলা না বলে পারল না, "বিশ্বাস কর দিদি আমি ভালই

আছি, কিন্তু যে কৈফিয়ৎ চাবে সেত চলে গেছে অপরের তা দিয়ে দরকার কি ?”

“তুমি জান না এ দুনিয়ার লোকগুলো নিজে সাধু সেজে মেয়েদের বেলায় যত দোষ ধরে বেড়ায় ; যা হোক কোথায় যাবে ?”

“জমিদার বাবুকে খুজতে বেরিয়েছি এখানে কোথায় তিনি এসেছেন জান কি ?”

“হা আমি তাকে সকালে সুরেন বাবুর বাড়ীতে দেখে এসেছি। চলত সেখানেই দেখিগে।” তরু বল্‌ল।

---

[৮]

ক্ষিতীশবাবু চা পান শেষ ক'রেই সুরেন বাবুর মুখের পানে চেয়ে বল্লেন "এমন ভাল চা ভাই আমি খুব কম খেয়েছি।"

যেরূপ তিনি এখানে দেখেছেন; এ বাড়ীর সবই বুঝি আজ তার কাছে মিষ্টি। ধন্য চোখ! তুমি সব ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য কর। তাই তুমি সবার উপরে মাথার কাছেই স্থানও পেয়েছ।

রূপের আস্বাদ চোখের নিমেষে মিলে যায়! কিন্তু গুণ জানতে হলে অনেক সময় লাগে তাই রূপের মোহে সবাই বড় শীঘ্র মজে।

"তোমার বৌদি চা করেছেন।" বলে সুরেনবাবু নিজের গৌরবে হেসে ফেল্লেন।

নিজের বাড়ীর গৌরবে নিজের স্ত্রীর প্রশংসায় আর নিজের হলে ত কথাই নাই আনন্দিত হয় না, উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না; এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়।

ক্ষিতীশবাবু হাসিমুখে বল্লেন,—"তা হলে ত দেখছি, বৌদির রান্না একদিন না খেয়ে থাকতে পারছি না। মুখে যে মিষ্টি লাগিয়ে দিলেন।"

"বুক কিন্তু আশায় দুর দুর করছিল! তাকেও থামাতে পারছিলেন না।

সুরেনের পক্ষে এ ভাবনার অতীত! তারই দেশের জমিদার,

তারই আশ্রয়দাতা, আজ উপযাচক হয়ে তারই গৃহিণীর স্বহস্তপ্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনের জন্য তারই দ্বারে প্রার্থী। এ থেকে আর কি সুখের জিনিষ সে ভাবতে পারে। উৎফুল্ল হয়ে সুরেন বল্‌ল, "সেত আমার সৌভাগ্য ক্ষিতীশবাবু। দেশের জমিদার গরীবের কুটীরে আজ বিদুরের খুদকুঁড়ার প্রার্থী হচ্ছেন। এর চেয়ে আর কি আমার পক্ষে আনন্দের থাকতে পারে। যাই বাড়ীর ভিতর বলে আসিগে।" সুরেন উল্লাসে বাড়ীর ভিতর গিয়ে শৈলজাকে ডেকে ডেকে বাড়ী মাথায় করে তুল্‌ল।

সকালবেলায় ধরা পড়বার পর থেকে শৈলজার মনটা বড়ই খারাপ ছিল।

শৈলজা একটা মিথ্যা দিয়ে স্বামীর নিকট বকুনি থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সত্য, কিন্তু বিবেক ত ছাড়বার পাত্র নয় তাকে যতই অবহেলা করনা কেন। যেখানে অতি গোপনে এক ক্ষুদ্র দেবতার আসন পাতা আছে—মনের সেই নিভৃত কন্দরে সে নিশ্চয়ই বুঝেছিল অসহায় নিরপরাধিণী বালিকার পর সব দোষ চাপিয়ে অব্যাহতি পেলাম। তাই ধরা পড়ার ভয় ও লজ্জা ছিল। স্বামীর ডাকেও স্বামীর সামনে যেতে পা সর ছিল না।

কিন্তু কারণ জানতে পেয়েই আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। সে দিন চারুর আর বকুনি খেতে হল না।

বাড়ীটা ভাবি নিমন্ত্রণের আয়োজন ও তজ্জনিত আনন্দোৎসবে যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন তরু সঙ্গে করে চপলাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ক্ষিতীশবাবু তখন বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হতে কৌশলে নিমন্ত্রণটা আদায় করে নিয়ে তাদের সেই আনন্দেই যোগ দিচ্ছিলেন। তিনিই ছিলেন সে আনন্দের সর্ব্বপ্রধান উদ্‌যোগী এবং যে বাড়ীতে ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে বাড়ী এখন তার নিকট মনে মনে মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চপলাকে সামনে দেখে ক্ষিতীশ বাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। মুখের সব খানি রক্ত যাদুবলে নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

তিনি দেশের জমিদার, অভিভাবক শূন্য স্বাধীন যুবক; তথাপি এরূপ হল। যদিও চপলা ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

যে বিবেকের বাধায় শক্তিমান যুবককে পাপের পথে চলতে গিয়ে প্রত্যেক পদে তাকে থেমে যেতে হয় এবং কুবুদ্ধির প্ররোচনায় মনের ভিতর জোর বেধে নিয়ে চলতে হয় এবং যে বিবেকের নিয়মে পাপীকে পবিত্র সাধুজনের সামনে মুহূর্ত্তের জন্যও মস্তক নত করে দাঁড়াতে হয় ইহা সেই বিবেকের প্রেরণা—সেই সনাতন নিয়মের ফল।

কিন্তু প্রথমে উদ্‌যোক্তা হয়ে তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করেছেন এবং যে কার্য্যের তিনিই পাণ্ডা, তার মুখ ভার হলে, তিনি পিছনে পড়লে হয়ত তার অনুবর্ত্তিগণ অন্য অর্থ বের করে একদম পিছিয়ে যাবে, ভেঙ্গে পড়বে।

তাই নেতা হয়ে কাজ করতে যাওয়ায় কত বিপদ ক্ষিতীশবাবু বুঝতে পারলেন। তিনি প্রসঙ্গটা চপলার সামনে চাপা দিতে গেলেও সুরেন তাকে জাগিয়ে রাখছিল।

ক্ষিতীশবাবু চান্ না চপলার কানে এতটা যায়; যদিও চপলার তখন কিছু শোনবার মত প্রবৃত্তি ছিল না।

তিনি না খেয়ে এখানে গল্পে মত্ত হয়ে আছেন, আর তাঁরই মা তাঁর আশা পথ পানে চেয়ে অনাহারে আছেন। চপলার শুধু মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগল। ব্যাপার দেখে চপলা যত শীঘ্র পারে একবার বাড়ীর ভিতর ঘুরে এসেই রাগের মাথায় বলে ফেলল—

"দাদা বাবু বেলা যে অনেক হয়েছে, বাড়ী চলুন।"

সুরেন ক্ষিতীশবাবুর মুখের দিকে চাইল। চপলার এ কাথাটা ইঙ্গিতে অনুমোদন করল।

তথাপি উঠি উঠি করে ক্ষিতীশবাবুর দেরি হতে লাগল। চপলা রাগ সামলাতে পারলা না। রাগের মাথা নিয়ে সে ভাবল—'নিশ্চয় ঐ ছুড়ীটা দাদাবাবুকে যাদু করেছে। যে রূপ আর যে কাঁচা বয়স। নতুবা দাদাবাবু না খেয়ে অমন চেহারা করে বসেই বা থাকবে কেন। বাড়ীতে কি গল্প করবার লোক নেই। ছুড়িটার আমি মুণ্ডপাত করতে পারি তবে আমার নাম চপলা। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে আশা।'

তার মনের ভিতর এ সোজা কথাটা ঢুকলনা যে সে ত অবলা-স্ত্রীলোক বাড়ীর বাহির হয় না। তার ক্ষমতাই বা কি যদি দোষ কিছু হয়ে থাকে ত তার দাদাবাবুই করেছেন। তাকেই শাসন করতে হবে। নিজের লোকের দোষ স্বার্থের আড়ালে ঢেকে পড়ে যায়। যত দোষ পরের ঘাড়ে আমরা চাপাই। প্রবৃত্তির বশে বড়

তাড়াতাড়ি নির্দ্দোষীর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দি, কিন্তু সময়ে যখন আসল ব্যাপার প্রকাশ পায় তখন আবার মনের পর রাগ করে বসি। এমনই অদৃষ্ট যে তখন একবারও ভাবি না, যে প্রবৃত্তি যখন চিত্তের পর অধিকার করে বসে মন তখন তারই মতে চলে।

ক্ষিতীশবাবু উঠলেন, চপলাও ছুঁড়িটার বিষয় ভাবতে ভাবতে তার মুণ্ডপাত করবার কল্পনা করতে করতে তার পিছন পিছন চলল।

---

[৯]

বামুনমেয়ের পাক শেষ হল অথচ অন্য দিনের মত আজ কেউ তাড়া দিতে ও আসল না। বসে বসে বিরক্ত ধরে গেল। চপলাই না এতক্ষণ তার পিছনে লেগে গেছল। তারই মুণ্ডপাত করতে উপরে চলল।

কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। বৌ ও মা স্নান সেরে বাসিমুখে চুপ করে বসে আছেন, দেখতে পেল। বল্‌ল "মা তোমাদের ভাত বাড়ব কি ?"

"বাবু কোথায় ?" মা বিরক্তির স্বরে বল্‌লেন। "কচি বৌ স্নান সেরে বাসিমুখে বসে রয়েছে পিত্তি পড়বে যে, সেটা কি তার হুশ নেই। এতটুকু বুদ্ধি না থাকলে তার সংসার ধর্ম্ম করতে নাই।"

বামুনমেয়ে সব কথা ভেবে বলতে পারত না। অপরের সঙ্গে কথা বলবার তার সময়ও থাকত না, তাই রক্ষে। সব সময়ে সে তার রান্নাঘরে খুটি নাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু যদি কখন বাহিরের লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হ'ত তা হলে তা'র গোলমাল বাধত। কি বলতে কি বলে বসত। বিশেষ চপলা তার কথা শুনে হেসেই কুটী কুটী হত। সে আজ সামনে নেই তাই রক্ষে, বল্‌ল—"মা ভাত বাড়বো।"

মা ও বৌকে আদেশ করে বললেন "আমি তোমার গুরুজনেরও গুরুজন বলছি—তার জন্যে না খেয়ে বসে থাকতে হবে না। যাও খাও গে কোন দোষ হবে না।"

মায়ের কথায় শুভার বড়ই লজ্জা করতে লাগল। কি বিপদেই সে পড়ল। স্বামী বাহিরে না খেয়ে রয়েছেন, আর সে এখানে আগে থেকে খাবে কিরূপে!

একটা বহুকালের রীতি, আজ তার নিকট জন্মগত সংস্কারের স্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত যায়গায় দেখেছি স্ত্রীর ভীষণ অসুখ, ডাক্তার সকাল সকাল খাবার ব্যবস্থা করে গেলেন কিন্তু স্বামী না খাওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রী কিছুতেই কিছু স্পর্শ করল না। অপরের কাছে অন্য একটা অজুহাত দিয়ে দিল। নেহাত এড়াতে না পারলে 'খেয়েছি' বলে খাবার লুকিয়ে রাখল। শুভা এত বড় বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে না অথচ মায়ের অবাধ্য হতে হয়—বিষম বিপদে পড়ল। মাথায় বুদ্ধি এসে গেল বলল "মা তুমিও চল।"

তিনি বুঝতে পারলেন, রাগের মাথায় বৌকে কি আদেশ করেছিলেন। ছেলেকে না খাইয়ে, কি করে খান্। তারা যাই হোক—তিনি ত মা। অন্য দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন "আচ্ছা আর একটু দেখাই যাক্ না। তারপর দুজনাই যাচ্ছি।"

শুভা জান্ত এই একটু ছেলেকে না পেলে কতক্ষণ হতে পারে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেল বটে, কিন্তু তিনি না খেয়ে রয়েছেন মন কি রকম করতে লাগল।

* * * *

চপলা চুপ করেই ক্ষিতীশবাবুর পিছু পিছু আসছিল। আজকের নানা ঘটনা তার মনে আঘাত করছিল।

তরুর কথা সে না ভেবে পারছিল না। তরুর উপকার তার মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তুলছিল।

সামান্য একটা ভুলের জন্য তরু কি শাস্তি না পাচ্ছে মনে পড়তে সে ক্ষিতীশবাবুকে না বলে থাকতে পারল না—

"দাদাবাবু তোমরা মেয়েদের সামান্য ভুল মাপ করনা কেন বলতে পার ?"

ক্ষিতীশবাবু বললেন—"অনেক যায়গায়ই করি। যেখানে করিনা জানবি, সেখানে সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হয়।"

চপলা বলল "দাদাবাবু তোমরা সবল আমাদের আশ্রয় স্থল; তোমরা আমাদের দোষ মাপ না করলে আমরা কোথায় দাঁড়াই ? শাস্তি দিতে হয় বেটা ছেলেদের বেশী করে দেও।"

নিজের ঘাড়ে শাস্তি লোকে সহজে নিতে চায় না। মনকে ফাঁকি দিলেও ক্ষিতীশবাবুর এখন এ শাস্তি প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াচ্চে। অথচ অন্যায় কাজ অন্যায় বুঝে কেউ করতেও পারে না। ক্ষিতীশবাবুও ভাবলেন তিনি অন্যায় কিছু ত করছেন না। যদি ওকে পেতে হয় বে' করবেন। ভাল পথে চলবার আশা বুকে নিয়ে যুবক বলে উঠল,— "বেটা ছেলেদের অন্যায় করতে দেখলে, শাস্তি নিশ্চয়ই দিতে হবে। আর সমাজেও তা দেয়।"

আবেগ ভরে চপলা বল্‌ল—"ছাই দেয়, বরং মেয়েকে দুর্গামের ভাগী করে কলঙ্কের বোঝা চির-জীবনের জন্ত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

চপলা তখন ঠিক করেছিল আজকের ঘটনা সে প্রকাশ করবে না। যার কাছে বলবার সে ত নেই, আর তার দেখা ত পাওয়া যাবে না। অপরের কাছে এ সব বলতে সে চায় না। আসল কথাটা কিন্তু তার স্বভাবের গুণে সে চায় সবাই হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দিক। জীবনের মাঝে কান্নার সুর বেজে উঠুক, ইহা সে মোটেই পছন্দ করত না।

তাই তার দিদিমণি শুভার কাতর মুখের দিকে চাইতে না পেরে আজ সে পাগলের মত ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। ক্ষিতীশবাবুর কাছে তাকে কিছু ওকালতি করতেই হবে।

মেয়েরা বেশ মুরুব্বি আনা চালে চলতে জানে। বার বৎসরের মেয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান বয়স্ক ভগ্নিপতিকে ঠকাতে যায় এবং দরকার হলে উপদেশ দিতেও ছাড়ে না।

"আচ্ছা দাদাবাবু, তোমরা অপরের কথা ভাবতে পার না কেন ?" চপলা বল্‌ল।

"কিসে বুঝলি পাগলি। আমরা কি এতই স্বার্থপর !" ক্ষিতীশ বাবু না ভেবেই বলে ফেল্লেন।

তার মন অথচ আজ সুরেনবাবুর বাড়ীতে পড়ে পড়ে কাঁদচে।

চপলা বল্‌ল—"তা আর নয় দাদাবাবু! এত বেলা হয়েছে মা ও দিদি না খেয়ে বসে আছেন। আর তুমি দিব্বি বসে বসে গল্প করছিলে। আমি না গেলে হয়ত বাড়ীর কথা মনেই হত না।"

ক্ষিতীশবাবু নিজের দোষ ঢাকতে গিয়ে বল্লেন "ইচ্ছা করে কি আর বেলা করেছি চপলা, ভুলে গিছলুম এত বেলা হয়েছে?"

চপলা বলল, "আমি ও তাই ভাবি দাদাবাবু এটা কিরূপে হয়। তোমরা ভুলে যাও, গল্প করে সময় কাটাতে পার, কিন্তু মেয়েরা ভুলতে না পেরে না খেয়ে বসে থাকে।"

মেয়েদের ওকালতি করতে তার বড় ভাল লাগল না। হাসি মুখে বলে উঠল—

"কখন ত শুনিনি মেয়েরা ভুলে খেয়ে বসে থাকে। ভুলটা তোমাদের এক চেটে না দাদাবাবু?"

চপলা ঠাট্টা করলেও ক্ষিতীশবাবুর মনে খোচা লাগছিল, অন্যায় হয়েছে।

মাথার উপর রৌদ্র খাঁ খাঁ করছে। সামনে বাড়ীতে বৃদ্ধা মা না খেয়ে, ছেলেরআশা পথ পানে চেয়ে বসে আছেন। অল্পবয়স্কা চপলা তাকেই পাড়ায় পাড়ায় খুঁজে নিয়ে তার পিছনে পিছনে আসছে।

সময়ের গতিকে ভাবের আধিক্যে বাড়ীর উপর টান আসতে লাগল। আর ছেলেমানুষী করবেন না ঠিক করেই বাড়ীতে ঢুকলেন। একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে মার পায়ের কাছে বসলেন।

"মা এতক্ষণ না খেয়ে বসে আছ। পিত্তি পড়বে যে, আমি ত বাহিরে চা খেয়েছি।" বলে বাহিরে কি কি দরকারী কাজ ছিল অনর্গল বলে যেতে লাগলেন।

"না মা স্নান করে নি। যে বেলা হয়ে গেছে আমার খাওয়া না হলে ত তুমি খাবে না। বলে তাড়াতড়ি তেল মাখতে বসে গেলেন।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মায়ের চোখে জল এল।

হায় মাতৃস্নেহ! ধন্য তোমায়! ছেলে শত অত্যাচার করেও যদি একবার মা বলে ডাকে, মা তুমি যে সব ভুলে যাও। তখনি কোলে তুলে নাও। সাক্ষাৎ তোমা হতে যার উৎপত্তি মা, তাকে তুমি ছাড়া কে বেশী যত্ন করতে পারবে।

মার কাছে ছেলে যে কি জিনিস সে মা ছাড়া ছেলে বুঝবে না।

---

[১০]

ক্ষিতীশবাবু খাবার পর আজ আর বাহিরের ঘরে না যেয়ে মায়ের কাছে ছুটে এলেন। ছেলে খেয়ে, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করল না, মায়ের কাছে ছুটে এল দেখে মার মনে পড়ল,—কাল ছেলেকে রাতে বড়ই বকেছি! রাগের মাথায় অত কড়াকথা ছেলেকে বলা উচিত হয়নি তার কেবলই মনে জাগতে লাগল। 'ওর কি আর বোঝবার বয়স হয়েছে! বৌ-র সঙ্গে ঝগড়া নিয়ে মায়ের কথা না বলাই ভাল। ওদের বোঝাপড়া ওরাই করে নিক।

মার প্রাণ নিয়ে কবে কে ছেলে অন্যায় করেছে ভেবে থাকে। তথাপি অনেক ছেলেই মায়ের মনে দাগা দেয়!

মা বল্লেন "এত বেলায় খেলি, একটু শুগে যা। এত বেলা পর্য্যন্ত আর খাটিসনে। তোর যে শরীর, কিছুই সয়না, ভেঙে পড়বে।

বিশ্রামের কথায় ক্ষিতীশবাবুর অনেক কথা মনে পড়ল। সে সৌভাগ্য তার কোথায়? বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাতে বলেই না কাল বকুনি খেয়েছে।

ক্ষিতীশবাবু বল্লেন "আচ্ছা, মা দাদামশায়ের কটী বে' ছিল?"

চপলা মায়ের খাবার জল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ছেলে গল্প করে তাকে সন্তুষ্ট করতে চায় ভেবে মা বল্লেন "কেন

দাদামশায়ের পিছনে লেগেছিস? তাঁর দুই বিয়ে ছিল। তখন ত আর এটা তত দোষের ছিল না।"

চপলা কথাটার মানে বুঝে নেবার জন্য আস্তে আস্তে জল রাখবার ভান করে একটু সময় কাটাতে লাগল।

ক্ষিতীশবাবু তাকে দেখতে পেলেন না বললেন—

"এখনও ত মা এটা খুব দোষের নয়। যেখানে বে দিলে আর বে-ভাঙ্গা যায় না তুমি দেখবে মা, সেখানে এপ্রথা থাকবেই।" কথাটা মা তলিয়ে বুঝলেন না—ইহা তার কাছে গল্প ছাড়া, দাদামাহাশয়ের উপরে নাতির উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হল।

কিন্তু চপলা কথাটার মানে বুঝতে পেরে শিউরে উঠল। এতটা হয়েছে। সে সুন্দরী ছুড়িটার পর তার বড়ই রাগ হতে লাগল। যতক্ষণ না তার মুণ্ডপাত করতে পারছে ততক্ষণ বুঝি আর তার শান্তি নেই। ক্ষিতীশবাবুর ব্যবহারে এতক্ষণ সে এই দরকারি কথাটা ভুলে ছিল।

চপলা শুভার অনুসন্ধানে ছুটে গেল। তাকে দু'কথা না শুনালে তার আজ আর মন স্থির হচ্ছিল না।

মা বলতে লাগলেন;—"এখনকার মেয়েরা একটু অভিমানী, না বাবা? তা পরের কাছে ত আর করে না নিজের স্বামীর কাছেই দেখায়।" মা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

ছেলে মায়ের ইঙ্গিত বুঝতে পারল। মার মনে ছিল কাল রাতে বৌকে বলেও ছেলের ঘরে পাঠাতে পারেননি।

মায়ের দৃষ্টিতে ও কথার ইঙ্গিতে ক্ষিতীশের মনে লজ্জা হল, অথচ এ লজ্জার ইঙ্গিতে যা করতে বলা হচ্ছে—তাও তার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

বৌর সঙ্গে কাল যা হয়ে গেছে এর পরে তিনি নিজে গিয়ে মিটমাট করতে পারেন না। আর তা করবার মত প্রবৃত্তি ও তার তখন ছিল না। তার মন তখন এক আশা-মরিচীকার পানে ছুটেছে। তার গতিরোধ করবে কে ?

ক্ষণভঙ্গুর নশ্বরদেহে এতদ্রুত-গতি মনকে নিয়েই যত গোল বাধে। দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল মনের সঙ্গে চলতে পারে না তাকে শাসনেও আনতে পারে না।

মুখের ভাব বিষণ্ণ হল, ক্ষিতীশবাবু শত চেষ্টায়ও তাকে ঢাকতে পারলেন না।

মা ছেলের মুখের ভাব দেখে হাসিমুখে বললেন "কাল বড় বকেছিলাম, কাশী যাবার কথায় বুঝি ভয় পেয়েছিলি। ছেলে কোলে না দেখে আমি যাচ্চি না।"

এত নরম মন নিয়ে মা ছেলেকে শাসন করতে যান। বারে বারে এ সব কথা তুলতেই ক্ষিতীশের মনে বড়ই লজ্জা হল এবং মায়ের ঘুমের বাধা হতে পারে ভেবে বাইরের ঘরে গেল।

---

[১১]

শুভাকে দেখতে পেয়েই চপলা বলল, "বাড়ীতে কি হয়েছে বলত। সবারই মুখ ভারী। একি আর সারবেনা?"

শুভা নিজেকে সামলাতে পারল না। "কেউ যদি কালো মেয়ে পছন্দ না করে তবে সে দোষ, কি আমার" বলতেই মুখ কাল হল।

চপলা ব্যথিতা হয়ে বলল "আমি কি সেই কথাই বলচি যে দুঃখ করছিস। বরকে একটু খোসামোদ করলে দোষ হয় কি?"

চপলা এই মাত্র যে কথা ক্ষিতীশ বাবুর মুখে শুনেছে তারপর তার মাথা ঠিক রাখা কঠিন। সত্যিই যদি বা বেটা ছেলে জুটো বিয়ে করে বসে তখন শুভার গতি কি হবে।

কাল রাত্রির ঘটনা শুভা ভুলতে পারেনি। স্বামীর নিকট থেকে অত বেশী অপমান নারী সহ্য করতে পারে না। তিনি যদি তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে সুখ পান; তাকে সহ্য করতে হবে। সে আর খোসামোদ করতে পারে না। তাই চপলার মুখ থেকে পুনরায় সেই খোসামোদের কথায় তার বড়ই রাগ হল; জোরেই বলল,—"তুই পারিস খোসামোদ করগে। আমি পারবনা বলে দিচ্ছি" বলেই মুখ বিকৃত করে যাবার জন্য উঠল।

চপলা শুভার কাপড় চেপে ধরে কাছে বসে বলল, "দুঃখ করিসনে বোন, আমি তোর ভালর জন্যেই বলছি। আমি যদি খোসামোদ করলে হয় ত দেখতিস কত খোসমোদ করতাম। তুই সুখে থাকবি তাই আমার সুখ"

শুভা বলিল—"সুখ বরাতে না থাকলে হয়না দিদি।" চপলার কথায় শুভার মন তখন নরম হয়েছে। মিছামিছি চপলার পর রাগ করে লাভ নেই বুঝল।

চপলা ব্যাথিতস্বরে বল্‌ল, "দুঃখ করিস না, বোন, জামাই বাবু তোকে একদিন চিনতে পারবেনই। আমি দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।"

চপলা উঠল। শুভা চপলার গম্ভীর মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়ে তোলবার জন্য বল্‌ল, "দেখিস যেন খোসামোদ করতে গিয়ে নিজেই হাত করে নিসনি।"

স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখ যখন গম্ভীর হতে থাকে, তখন যে বড়ই ক্লেশদায়ক দৃশ্য হয়। ভালবাসার জনে তা সহ্য করতে পারে না। চপলাও বল্‌ল, "আমার হাতে এলে, তোকেই স্বত্ব ছেড়ে দেব।"

শুভা হেসে বল্‌ল, "তাত জানি, তবু—"

চপলা বল্‌ল, "তবু নয়রে, স্বামীর ভাগ দেওয়া মেয়েদের পক্ষে বড়ই শক্ত। তা দিতে হলে তোর মত মেয়ে বোধ হয় বাঁচবে না।"

চপলার মনে অনেক সঙ্কল্প আর অপেক্ষা করল না।

একেবারে ক্ষিতীশবাবুর সামনে গিয়ে হাজির হল।

চপলা অতি সন্তর্পণে ক্ষিতীশ বাবুকে বল্‌ল, "দাদাবাবু স্বরেন বাবুর স্ত্রী আমাকে একবার দেখা করতে যেতে বলেছিলেন—যাব কি ?"

চপলা ও বাড়ীতে যাতায়াত করে ক্ষিতীশবাবুর পছন্দ নয়। নিজের গোপনীয় বিষয় কেহই সহজে প্রকাশ করতে চায় না। বলিলেন। "তোমায় তিনি যেতে বলেছেন আমি বারণ করব কেন ?"

ক্ষিতীশবাবুর কথার স্বরে চপলা বুঝল আন্তরিকভাবে অনুমতি পাওয়া গেল না। সে জানত আন্তরিকভাবে অনুমতি পাওয়া যেতেও পারে না, তাই বড় দুঃখিত হল না, বলল।

"দাদাবাবু ও বাড়ীর সুন্দরী মেয়েটাই না বার বার অনুরোধ করতে লাগল। বলল 'আমার এখানে কেউ সমবয়সী নেই যে দুটা কথা বলা যাবে' তাতেই না গিন্নী আমায় যেতে বলেছেন। তা—তুমি যদি বারণ কর যাব না।"

ক্ষিতীশবাবু সন্দেহের চোখে চপলার মুখপানে চাইলেন—কিছুই বুঝলেন না। স্পষ্ট বারণ করতেও পারেন না। বললেন, 'বারণ করব কেন তুই যা।'

ক্ষিতীশবাবুর গলার স্বর শুনে চপলা মনের হাসি চেপে রেখে বলল "আচ্ছা যদি মেয়েটা আমাদের বাড়ীতে আসতে চায়! যে ছোট বাড়ী ওদের। ওরকম বাড়ীতে থাকলে আমরা ত হাঁপিয়ে পড়ি। ক্ষিতীশবাবুর মনে হল তা হতে পারে না। বললেন, "হঠাৎ ডেকে আনা সঙ্গত নয়।"

"তবে কি আমি যাবনা দাদবাবু"—বলেই ক্ষিতীশবাবুর মুখের দিকে চপলা চাইল।

ক্ষিতীশবাবু সে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না ; উত্তর দিলেন—

"তোকে যেতে কে বারণ করছে"—

চপলা বেরিয়ে গেল।

---

[১২]

সখিচরণ বাধা দিতেই রামচরণ তরুও চপলাকে পথ দিল। মনে কিন্তু ঠিক করল তরু চপলাকে সঙ্গে করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসবে।

দাসীকে এ অবস্থায় যেতে দিলে যে জমিদারের অত্যাচারে তার হাড় মাংস এক যায়গায় থাকবে না। তার বাড়ী ঘর দুয়ারের চিহ্নও মুছে যাবে। তার মনে হল কিরূপে তার জ্ঞাতিভাই তাদের জমিদার দ্বারা নির্য্যাতিত হয়েছিল।

সামান্য দোষে তাকে চৌদ্দপোয়া দিয়ে ইট ঘাড়ে করে সারাদিন সূর্য্যের পানে চেয়ে থাকতে হয়েছিল। রাতে জলের ভিতর বেঁধে রেখেছিল। দু দিন খেতে দেয়নি। হতভাগা সেই অবধি ভাল করে চোখে দেখতে পায় না। শেষে জুতা মেরে অজ্ঞান করে ফেলে দিয়ে যায়। এখনও সে অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিছানা থেকে উঠতে পারে না।

বিপদের ভীষণতায় রামচরণ মনে করতে পারছিল না—তরু দাসীকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। তার চিন্তাশক্তি ক্ষণেকের জন্য লোপ পেয়েছিল।

সে চুপ করে বসে র'ল কখন তারা আসে। তরুকে কিন্তু একলা দেখতে পেয়েই তার মাথা ঘুরে গেল। চোখে কিছু দেখতে

পেলনা শুধু একখানা ইট হাতে করেছে, বুঝতে পারল। পরক্ষণেই তরু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার মাথার রক্তে বস্ত্র ভিজতে লাগল।

রামচরণেরও আর কিছু ভাবতে হল না। সামনের ঢেঁকির বাড়ীতে চিৎ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

সখিচরণ খুন হল ভেবে দৌড়িয়ে বনের ভিতর ঢুকল।

গ্রামে রব পড়ে গেল দুজনায় খুনোখুনি করেছে। কিন্তু ভাগ্যের গুণে যমের বাড়ী থেকে দুজনাই ফিরে এল।

মেয়েদের গল্পের ধারা হল তরু সখিচরণকে বড়ই ভালবাসত। তার অসাক্ষাতে রামচরণ জোর করতে গিয়ে এই ব্যাপারট হয়েছে।

পুরুষেরা ঠিক করল, মেয়েদের ধারণা স্বভাবে দুজনাকে নিয়ে এইরূপ হয়েই থাকে। এত আর নূতন নয়, আবহমান কাল থেকে হয়ে আসছে।

[১৩]

তরুর অবস্থা চপলা শুনতে পেল।

তার আর সুরেনবাবুর বাড়ীতে সেদিন যাওয়া হল না। সে বেশ বুঝতে পারল তার জন্যেই তরুর আজ এ দুর্দ্দশা! অন্য কিছু তার মনেই এল না।

প্রবৃত্তি যে পথেই চলুক সে যতদুর ভাল কিংবা মন্দ হোক মন কিন্তু ঈশ্বরের অংশ। সতো সে সব সময় সাড়া দেয়; মনে আবছায়া জাগিয়ে তোলে!

চপলাও কতকটা ব্যাপার বুঝতে পারল। সে আজ জানতে চায়না তরু কে। সে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। নিজের জীবন দিয়ে পরোপকার করে ধন্য হয়েছে। এ শাস্তিতে তার পুরান জীবন ধুয়ে গেল; এ পুনর্জীবন বুঝি তার বড়ই দরকার ছিল। আজ চপলা তার সামনে গিয়ে হাজির হল।

তীব্র আকাঙ্খা হৃদয়ে জাগলে তার সুবিধামত ঘটনা আপনি ঘটে যায়। কেন যে হয়, এর উত্তর পাওয়া যায় না। যে কৌশলে জীব গড়ে ওঠে আবার শেষ হয়ে যায় এও বোধ হয় সে কৌশলেরই একটা দিক। আমরা সব জিনিস যেমন বুঝতে পারি না কতকটা বিশ্বাস করতে পারি না, এটাও তেমনি বিশ্বাস করতে পারি না। বিশ্বাস

একবার যারা করতে পেরেছে তাদের মিলেছে। সে বিশ্বাস তাদের আর হারাতে হয়নি।

এ আকাঙ্খার জোরেই কি চপলা ঘরে থাকতে পারলনা! সে ঠিক সেই সময় গেল যখন তরু যাকে জীবন দিয়ে ভালবেসেছে, যার জন্যে সে সব হারিয়ে কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়েছে সে তাকে ত্যাগ করে গেছে যখন সে শয্যায় একধারে একলা পড়ে ছটপট করছে আরত কেউ তার আসবার নেই। জগতের বন্ধন, সমাজ বন্ধন সে ছিন্ন করেছে; কেউত তার দিকে তাকাবার নেই। ছিল সেই একজন যাকে সে এতদিন অসময়ের কাণ্ডারী জ্ঞানে মন প্রাণ দিয়ে বাঁধতে গিয়েছে—কিন্তু সে এখন কোথায়!

তারও ভালদিন ছিল। যখন তার যৌবনের লোভে তারই করুণাপ্রার্থী কত যুবক তার আশেপাশে ঘুরেছে। সে একবার ফিরেও তাকায়নি। একজনকেই আকড়ে ধরেছে আর আজ তার কি ভীষণ প্রতিকল।

একলা ঘরে ছটফট করতে করতে তার মনে পড়তে লাগল—যদি সে আজ ঘরে থাকত তাহলে তার আত্মীয় স্বজন তাকে কি এ অবস্থায় একলা ফেলে রাখতে পারত—কখনই না। যদি তার স্বামী বেঁচে থাকত তা হলে আজ এ অবস্থা তার নিকট লোভনীয় হত।

চখে জল আসতে লাগল।

ভালবাসা কথার কথা। বে'টাই আসল। তিনি লোকের তাড়নার ও সমাজের লাঞ্ছনার ভয়ে আমাকে ছাড়তে পারতেন

না। আর আজ কোন আইনে সখিচরণ লোকের চক্ষে দোষী হবে ?

তার মনে পড়তে লাগল সব মিছে। পুরুষজাতি দুদিনের যৌবনের লোভে আসে, নানা বাঁধনে বেঁধে রাখলে পালায় না। কিন্তু পালাবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না।

ঘৃণিত জীবনের পর তরুর বড়ই রাগ হল! ভালবাসার জন যদি এ অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারে তবে তা দিয়ে আর কাজ কি।

বরং পরের উপকার করতে হবে। যদি ভগবান দিন দেন লম্পটের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। জীবনটাকে জগতের কাজে সঁপে দেব।

মাথায় খুব বেদনা লাগল না মনের বেদনা সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। চেয়ে দেখল—চপলা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে একটা তীব্র আকাঙ্খা জেগে উঠল—পরের উপকার করতে হবে। তারাই এসে বিপদের সময় পাশে দাঁড়ায়।

চপলাও তরুকে ফিরতে দেখে বলল—

"পরের উপকার করতে গিয়ে আজ যে শাস্তি পেলে বোন, সে তোর কাছে দেবতারই আশীর্ব্বাদ।"

তরু কাতরে বলল "দেবতার আশীর্ব্বাদ কি না জানিনা—তবে জীবনের ধারা বদলে দিচ্চে। আমায় এবার পথ দেখা। আমি বুঝেছি—তুমি বড় সাধারণ মেয়ে নও।

অনেক অত্যাচার এ চক্ষে দেখেছি কিন্তু সেদিন তোর হাতধরে

বুকের ভিতর যে তেজ, যে সাহস পেয়ে ছিলাম। কই আর কখনও ত তা পাই নি। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।”

চপলা বুঝল, তরু আগেকার জীবনের জন্য অনুতপ্ত হচ্চে। লোকে যখন অবাধে পাপের পথে চলতে থাকে তখন সে কিছুই বুঝতে পারে না। প্রবৃত্তি চিত্তকে ঢেকেই রাখে।

প্রবৃত্তিই চিত্তকে ক্রিয়াবান করে। কিন্তু চলতে চলতে ধাক্কা পেয়ে যে মুহূর্ত্তের সে জেগে উঠে সেদিন অনুতাপ এসে তাকে পুড়িয়ে খাঁটি করে ফেলে।

আর কথা বলতে না দেবার জন্যই চপলা বলল “এখন চুপ কর বোন, আমাকে একটু আহত স্থানটা দেখতে দে।”

তরু চুপ করল। সরলা মাথাটা দেখে বুঝতে পারল আঘাত সাংঘাতিক নয়। একটু চূণ ও হলুদ মিশিয়ে বেঁধে দিল; আর দিল তার অসীম সহানুভূতি, যত্ন, সেবা, যাতে করে তার বেদনা অর্দ্ধেক সেরে গেল।

ভালবাসার চিকিৎসার চেয়ে মনোপ্রধান জীবের কাছে আর ভাল চিকিৎসা কি হতে পারে।

———

[১৪]

চপলা আজ সুরেনবাবুর বাড়ীতে যেতে পারেনি জানতেই ক্ষিতীশবাবু আর ঘরে থাকতে পারলেন না। তার মন এতক্ষণ চপলার কাছে সংবাদ পাবে বলেই যে ঘরে ছিল।

তার মনে পড়ল না—যে সময়ে তিনি সুরেনের বাড়ী যাচ্চেন, সে সময় সুরেন কোনদিন বাড়ীতে থাকে না। আর এ সময়ে সুরেনকে তার বাড়ীতে খুঁজতে গেলে তা শৈলজার চখে কি রকম দেখাতে পারে। কিন্তু তখন তিনি সেজেগুজে বাহির হয়েছেন; তাকে না দেখে আর তার ফিরবার ক্ষমতা ছিলনা। একবার দেখতেই হবে।

নবীন যুবা রূপের নব উন্মাদনায় মরিচীকা পানে ধাবমান। এ সুধা তখন তাকে পান করতেই হবে।

জগতের সব জিনিস দুদিনেই পুরান হয়ে যায়, জগতের আকর্ষণ কদিনই বা থাকতে পারে; যদি তাতে করে এই মোহ এই উন্মাদনা না থাকত। তবে তার দুর্ভাগ্য, যুবক তার জীবনের আনন্দস্বরূপিনীকে, যে তার জন্য অনন্ত সুধা কানায় কানায় ভরে তার দুয়ারে এসে দাড়িয়ে রয়েছে তাকে চিনতে পারল না। মনকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল মরিচীকা পানে। পাগলের মত বিদ্রোহী মন তখন চারিদিকে আর দৃষ্টি রাখতে পারছেনা। তাকে প্রবৃত্তির দাস হয়ে সব ভুলে যেতে হচ্চে।

ক্ষিতীশ আজ আর ফিরতে পারল না, বাহিরের ঘরে বসল। শৈলজা জানতে পেল।

সে উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী অভিমানিনী হয়েও দুর্ভাগ্যক্রমে গরিবের ঘরের গৃহিণী হয়েছে। যদি সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন উপায় পায়, ছাড়বে কেন।

স্বামীর নিকট থেকে ওবেলা ক্ষিতীশের সঙ্গে আলাপ করতে অনুমতি পেয়েছে। আজ সে সুযোগের শৈলজা সদ্‌ব্যবহার করবে।

চিরজীবন গরীব হয়ে থাকা তত কষ্টকর নয় যখন জানতে পারি উপায়হীন। আর কোন পথ নেই। কিন্তু গরীবের সামনে বড়লোক হবার পথ দেখালে তখনই মনে হয় নিজে কত গরীব। উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় লোককে যেমন সৎপথে নিয়ে জগতের অশেষ কল্যাণ করছে তেমনি আবার অসৎপথে টেনে এনে জগতে অশেষ অনিষ্ট আনছে।

শৈলজা আলো নিয়ে ক্ষিতীশবাবুর সামনে গিয়ে হাজির হল। একমনে ধ্যান করতে করতে যুবক যার রূপকে আকার দিয়ে সামনে এনেছিল, স্বপ্নের মোহে যাকে সামনে দেখতে চোখ মেলল তাকে পেল না, দেখল তার পরিবর্ত্তে আর একজন আলো হস্তে সামনে দাঁড়িয়ে।

যুবক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কি করতে হবে, কি বলতে হবে এখন তাকে।

সে এতক্ষণ যাকে বলবার কথা গুছিয়ে নিয়েছিল, যার কাছে সে

হাত ধরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে ঠিক করছিল সে কোথায়! সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। মনে বড়ই গোলমাল। নূতন চিন্তা করে ঠিক করবার মত আজ তার সামর্থ্য কোথায়! বলে উঠল "আপনি, আপনি, কি করতে হবে?"

কথার স্বরে শৈলজা হাসি মুখে বলল "এমন কঠিন কিছু করতে হবে না, শুধু সামান্য কিছু খাবার দিচ্চি, এই খেতে হবে।" বলে শৈলজা আলো রেখে বাইরে এল।

নিজে খাবারের থালা হাতে করে চারুকে পান ও জল নিয়ে সঙ্গে আসতে বলল। শৈলজা ক্ষিতীশবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু চারু পান জল রেখেই পালিয়ে গেল।

ক্ষিতীশবাবু দুই একবার বাহিরের দিকে কার আশায় চাইতেই শৈলজা পিছন ফিরে দেখল চারু চলে গেছে।

দুই এক কথায় ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে শৈলজা আলাপটা জমিয়ে নিল। সে যেন নিজের দেবরের সঙ্গে আলাপ করছে এমন নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল, এবং ক্ষিতীশবাবুর নিকটে থেকে আপনার জনের মত কথা আশা করে বলে বার বার অনুযোগ করতে লাগল।

"আমারত ঠাকুরপো আর দেবর নেই, তুমি অত সঙ্কোচের সহিত কথাবার্ত্তা বলছ কেন। ওতে আমার মনে বড় লাগে—"

ক্ষিতীশ বাবু বুঝতেই পারলেন না, কি কথা বললে বৌদি সন্তুষ্ট হন।

দুই একদিনের আলাপে নিঃসম্পর্কীয়া মেয়েদের সঙ্গে কত খোলাখুলি ভাবে কথা বলা যেতে পারে।

শৈলজা আজ ক্ষিতীশ বাবুর মনের কথা তার নিজের মুখে শুনবেই। মেয়েরা পুরুষদের খুব শীঘ্র নিজের করে তুলতে পারে। বাঙালীর বাসর ঘরে অজানা অচেনা যুবককে একদিনেই যে কত আপনার করে নেওয়া হয় তা অনেকেই জানেন।

আজ শৈলজাও একটা সম্পর্ক পাতাতে চান। তিনি শুনেছেন বিধবার বিয়ে অনেক যায়গায় হয়েছে। হতভাগিনী চারুর বরাতে যদি এমন একটা বর জুটে যায় সে ত তার সৌভাগ্য বলতে হবে।

চিরজীবন যাকে হাহুতাশ করে পরের দেওয়া দুমুঠো অন্ন কুকুরের সামিল হয়ে খেতে হত, যৌবনের সব সামনের দিনই যার পড়ে রয়েছে, হয়ত কত কেলেঙ্কারী কত কুৎসা যার নামে পাড়ায় পাড়ায় বেরুত তাকে আজ বাস্তবিকই ভাগ্যবতী বলতে হবে যে এমন পুরুষের সুনজরে পড়ে গেছে।

অভাগিনীর একটা কিছু উপায় না করতে পারলে শৈলজা যেন আর শান্তি পাচ্ছে না। তার মতে জমিদারের ছেলের দুটা বিয়ে এমন কি দোষের হতে পারে। আর তিনি বিধবার বিয়ে করলে এখানে এমন কারই বা সাধ্য আছে যে তার বিপক্ষ হয়ে দু কথা তাকে শোনাবে। কিন্তু তার নিজের মুখ দিয়ে এ শুভ প্রস্তাব শৈলজা প্রথমে বাহির করতে পারছে না।

• এ বিয়ের বুঝি এমনি ধারা, এতে এমনই একটা নূতনত্ব

আছে। এ ত আর এখনও বাঙালীর সনাতন বিবাহ প্রথার আসন পায়নি—যে বিবাহে বরকনের পরস্পরকে দেখার দরকার হয় না। চিরজীবনের সাথি অপরে ঠিক করে দেয়। এ বিয়েতে ত আর হৃদয়ের বিনিময় চায় না, চায় সমাজের নীতি-অনুসরণ। কে বলবে তা কি!

কিন্তু শৈলজা মনে মনে বুঝল বিধবার বিয়ে, বিয়ে হলেও নূতন রকমের। তাদের দুজনার মতের পর নির্ভর করছে। বরের মাকে সহজে রাজি করা যাবেনা।

পরস্পরের ভালবাসার টানে মিলতে হবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দিলেও তা টিকবে না। কিন্তু ছুঁড়িটাইত গোল বাধাচ্চে। নিজের ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা কবে হবে! তা না হলে আর এমন বরাত হয়!

ক্ষিতীশের খাওয়া হলে থালা হাতে করে শৈলজা বাইরে এল।

"চারুকে বলল, দুটো পান দিয়ে আয়ত। তুই একটু কাছে থাকিস, আমার একটু কাজ আছে, পালিয়ে আসিস না। আমি কাজ শেষ করে শীগ্‌গির যাচ্চি। জমিদারের ছেলে যেন একলা বসে থাকেন না।"

চারু পান নিয়ে কাপড় যত দূর সংযত করতে হয় করে পান দুটো অতি সন্তর্পণে দূর থেকে এগিয়ে দিল।

ক্ষিতীশ বাবুর চোখ আর অন্য দিকে যেতে চায় না। কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাকলেও যতদূর তার চখে পড়ছিল এবং কল্পনা

করতে পারছিলেন তাহাতে তার মনের সামনে এসে দাঁড়াল এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ষোড়শী যুবতীর যৌবন-ভারাক্রান্ত কম্পিত দেহ। একে পাবার আশা বাস্তবে পরিণত হতে চললে কঠোর সংযমী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও বুঝি মন ঠিক থাকে না। চারু চলে যায় দেখে ক্ষিতীশ কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—"দাঁড়াও, আমি জানতে চাই, তুমি আমায় ভালবাস—" চারু কথাটা শোনা মাত্র স্থান ত্যাগ করল।

শৈলজার সামনে পড়তেই সে বলে উঠল—"লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জান না? একা আছেন, একটু কথা বলতে বললাম, পারলে না?"

চারুর বড়ই রাগ হল। যে ভালবাসার কথা বলতে পারে—সে আবার ভদ্রলোক। এরূপ ভদ্রলোকের সামনে সে আর কখন যাবে না ঠিক করেই এসেছে। সুতরাং কোন কিছু উত্তর দিল না, বাইরে যাবার চেষ্টাও করল না।

শৈলজা চারুর অবাধ্যতায় বড়ই রাগান্বিত হইল। ছেলের কাছে বৌ লজ্জায় না যেতে চাইলে শাশুড়ী রাগ করলেও দুদিন অপেক্ষা করবার সময় পান। কিন্তু শৈলজার ঢের বেশী রাগ হল। তার ত অপেক্ষা করবার সময় নেই।

চারুকে পুনরায় চোখরাঙিয়ে আজ্ঞা করতে চারু কেঁদে চোখ মুছতে মুছতে শৈলজার সামনে থেকে এমন ভাবে চলে গেল যে শৈলজার রাগের মুখেও বুঝতে একটুও দেরি হল না যে যতই বকবে যতই ভয় দেখাবে সে আর বাহিরের ঘরে যাবে না। আজ সে

মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার স্বামীর অপমান যে করতে পারে সে যেই হোক তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গেল। শৈলজা গোলমালে পড়ল। তাকেই বাইরের ঘরে যেতে হল। সুন্দরীকে "ভালবাস কিনা" জিজ্ঞাসা করবার পর থেকে ক্ষিতীশবাবুর মনে যে কোনই চিন্তা আসতে পারে, মুখে যে কোন কথাই বাহির হতে পারে।

যত রকমে মানবের পতন সম্ভব হয়েছে তন্মধ্যে কামিনী-রূপমোহ অদ্বিতীয়! সুদূর অতীত কালের ইতিহাস থেকে প্রত্যেকের মন পর্য্যন্ত ইহার সাক্ষ্য দেয়।

সৌন্দর্য্যের অনুভূতি করতে পারা মানবের সব চেয়ে বড় শিক্ষা কিন্তু তাকে কামগন্ধ কলুষিত করেই না আমরা যত দোষ করে ফেলি।

জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত পূর্ণিমা যামিনীতে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পার্শ্বে সদ্য-স্নাত বৃক্ষরাজির তলে দাঁড়িয়ে যে নিজেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ডুবিয়ে দিতে পারে, সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করবা মাত্র যে সেই মাতৃরূপিণীর সৃষ্টিকৌশলে আশ্চর্য্য হ'তে পারে, সে ধন্য, তার সাধনা অদ্বিতীয়!

আবার কেহ কেহ কিন্তু নির্জ্জন প্রান্তরে ডাকাতি করবার সুবিধা পেয়ে পরস্বাপহরণ করতে ছাড়ে না। সুন্দরীর রূপ ভোগ করতেও ত অনেকে লালসা বাড়িয়ে তোলে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়!

ক্ষিতীশবাবুর মন তখন দোলায়মান। চিত্তের ধৈর্য্য তিনি হারিয়েছেন, বললেন—"আপনারা কি ওর বিয়ের চেষ্টা করছেন না ?"

কার কথা বলা হচ্ছে তা বুঝতে শৈলজার দেরী হ'ল না, চট ক'রে উত্তর দিল—"কেউ বে' করতে চাইলেই, চেষ্টা করতে পারা যায়। তবে বড় হয়েছে, ওর মত নিয়ে কাজ করতে হবে।"

এ কথাটা ক্ষিতীশবাবুর মনে আঘাত করল,—মত জানা উচিত। তিনি জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাননি। ঠিক বুঝতে পারলেন না, লজ্জা এর কারণ না আর কিছু।

চারুর মন জানবার জন্য ক্ষিতীশবাবু অস্থির হলেও উপায় ছিল না। সেদিনকার মত তাকে চুপ করে যেতে হল।

ক্ষিতীশকে চুপ করে থাকতে দেখে শৈলজার সন্দেহ হল—ভুল বুঝেছি কি—না, তা হতে পারে না। সন্দেহ ভাঙতে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতেও পারলেন না।

শৈলজা নিজের মতলব মত যতদূর সাধ্য কৌশলজাল বিস্তার করেছে। এ পর্য্যন্ত কোন বড় বাধা পায়নি। বড় আশা আছে তার মতলব মত এ বে' একদিন হবেই। এখন হঠাৎ যদি চির দিনের মত ভেঙ্গে যাবার উত্তর শোনবার সম্ভব হয়ে পড়ে সে কথাটা মন শুনতে চায় না, মনের পক্ষে তা সহ্য করতে পারা কঠিন।

শৈলজা বল্‌ল "মেয়েদের মত ঠাকুরপো! বড় বেশী জোরের

হয় না। তারা যে পরাধীনা এবং ছেলের মতটাই আগে বিশেষ করে জানা দরকার। ছেলে মেলাও খুব কঠিন।"

ক্ষিতীশ উত্তর দিতে দেরি করল না—"তা বোধ হয় পাওয়া যাবে—বেশী খুঁজতে হবে না বৌদি। অনেকে অমন মেয়ে আগ্রহে নেবে।"

শৈলজার মনের সন্দেহ কেটে যেতে লাগল। ক্ষিতীশও আর বেশী কিছু বলতে না পেরে উঠে পড়ল।

---

[১৩]

চারু নিজের ঘরে গিয়েই বসে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, কাকিমা কি কিছুই জানেন না। তারই কাছে জোর করে পাঠাতে চান যে ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জিত হয় না।

আর যদি তার জ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে তবে সে কোথায় দাঁড়াবে, কে তাকে এ সময়ে আশ্রয় দেবে? তিনি ত যাবার সময় এই যায়গাই আমায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এই আমার মহাতীর্থ। পুণ্যক্ষেত্রেই যদি আমার ভাগ্য দোষে স্থান না মেলে তবে—আর চারু ভাবতে পারে না, এর শেষ কোথায়।

স্বামীর ধ্যানে স্বামীর চিন্তায় চারু নিজের মন ধুয়ে নিল। তিনিও চারুর মনের চখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চারুর পূজা গ্রহণ করলেন।

* * * *

তরুকে একটু সুস্থ করতে পেরেই চপলা সুরেনবাবুর বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হল। তরু কিন্তু আর বাড়ীতে থাকতে চায় না। সে চপলাকে ছাড়বে না।

পাপের পথে ছটফট করে অতীত জীবনের ইতিহাস মুছে ফেলে

কল্পনাতেই ভবিষ্যৎ ভাল করে গড়্‌ছিল। তার আনন্দেই সে আজ মজে আছে। এবং চপলাকে কাছে পেয়ে তার কল্পনা আজ মুক্তি পেয়েছে। সে সুখ আর তার ছাড়বার ক্ষমতা নেই।

চারিদিকের ঘর দুয়ার জিনিষ পত্র তখন সাপের মত ফণা বিস্তার করে তাকে দংশন করছিল। সে বিষের জ্বালা তখন তার অসহ্য।

তরু বলল—"পায়ে পড়ি দিদি! আমায় একলা ফেলে যাসনে। আমায় নিয়ে চল।"

চপলা মুস্কিলে পড়ল। একজনের জন্যেই সে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। কিছু উপায় না করতে পেয়ে মনে শান্তি পাচ্ছে না। আবার তরুও এমন ভাবে আত্ম সমর্পণ করছে যে তাকেও সে দূরে রাখতে পারছে না।

নিজে বড় হলে অপরে আঁকড়ে ধরে, তাদের সঙ্গে করে নিতে হয়। বড় লোকের ভার ক্রমেই বড় হয়ে পড়ে। তাদের গুণ প্রকাশের এতে সুবিধা হয়। জগতের সামনে আদর্শ হয়।

চপলা অনেকক্ষণ ভাবল কিন্তু তরুকে 'না' বলতে পারল না। এক-জনের উন্নতিতে সহায় হতে পারলে মন কিছুতেই 'না' বলতে চায় না। চপলাকে রাজি হতে হল। যতটা সম্ভব নিজের কাজ বলে চপলা তরুকে সঙ্গিনী করল। সুরেনবাবুর বাড়ী এল।

ক্ষুদ্র শক্তিদ্বয় মিলিত হয়ে সংহতির জোর পেল। প্রত্যেকেরই নিজের দোসর আছে ভাবতে পারল।

শৈলজা চপলাকে দেখতে পেয়েই মনে ঠিক করল, এ ক্ষিতীশবাবুর দূত হয়ে এসেছে, এবং কি কার্য্য সাধন তার লক্ষ্য, বুঝতে পারল। চপলার অভ্যর্থনা বেশ একটু আদরের সঙ্গেই হল।

শৈলজা বল্ল—"কি মনে করে এসেছ বাছা।"

চপলা হাসির সহিত বল্ল,—"জমিদার বাড়ীর চাকরি পোশাচ্চে না, তাই নূতন চাকরি খুজতে এসেছি।"

শৈলজার মুখ অন্ধকার হল সে তাড়াতাড়ি বল্ল "কি হয়েছে? অমন সুন্দর মনিব!"

"হবে আর কি বাবুর সঙ্গে বাড়ীর কারুরই বনছে না। বাবুকে বল্লেও উত্তর দেন না। আজ কিন্তু পাঠিয়েছেন এখানে চাকরীর জোগাড়ে—"

শৈলজার মুখের অন্ধকার কেটে গেল।

তাদের এখানে ঝিকে চাকরী খুঁজতে পাঠানর অর্থ শৈলজার বুঝে নিতে দেরি হল না।

"আমাদের ত অবস্থা তিনি জানেন, আমরা কোত্থেকে লোক রাখব।"

চপলা হেসে বল্ল "সে তিনিই জানেন। এ সব ভেবেই তিনি পাঠিয়েছেন। এত বাড়ী থাকতে এ বাড়ীতে ত পাঠালেন।"

শৈলজার মাথায় সবটা ঠিক এল না, বল্ল—"তোমায় কিছু বলে দেছেন ?"

চপলা বল্ল "কি জানি। বড় লোকের হুকুম, ভয় হয়। সব

ভাল করে তার মুখে শুনতে সাহস হল না। তবে কতক কতক জানতে পেরেছি।"

শৈলজা অনেকটা বুঝে নিল! সে যে কাজের লোক বুঝতে পারল।

শৈলজা বল্‌ল "আচ্ছা নিজের ঘরের মত সব দেখে-শুনে নাও—থাকবার বন্দোবস্ত পরে হবে।"

চপলা শৈলজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। কিছু না বলেই একেবারে চারুর সামনে গিয়ে হাজির।

রূপ বটে! সে মেয়ে মানুষ, তাকেই টানছে, তা দাদাবাবুকে হাত করবে সে আর আশ্চর্য্য কি!

চারু অপরিচিতাকে সামনে দেখে আশ্চর্য্য হ'ল, কোন কথা বলল না। জগতের গতি তাকে এমনই ঠকিয়ে চলেছে যে, সে নূতন যা কিছুতেই এখন ভয় পায়।

চারুকে চুপ করে থাকতে দেখে চপলাকে নিজেই কথা বলতে হল "কি গো বাছা, তোমাদের বাড়ীতে এলাম, একবার কথা বলারও সময় হচ্ছে না।"

চারু বল্‌ল "আমি ত বাড়ীর গিন্নী নই কাকিমার সঙ্গে দেখা হয় নি?"

চপলা হেসে ফেল্‌ল—বল্‌ল, "আমি ত চুপি চুপি আসিনি, তোমার কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই এসেছি।"

চারুর গোলমাল বাধল। তার কাছে কার কি দরকার হতে পারে! দরকারের কারণটা কিন্তু অপরের কাছেই থাকে।

অতিথি বলে যে যত্ন করে আলাপ করতে এসেছে, তাকে বিমুখ করা উচিত নয়—ভেবে চারু বলল "বসো।"

চপলা আলাপের প্রথম সুবিধা করে নিল। কিন্তু তাকে চারুকে আঘাত দিয়ে মনের অবস্থা জানতে হবে।

রাগের মাথায় নিজের স্বরূপ বড় সহজেই আমরা বের করে ফেলি। অপরকে আমাদের দুর্ব্বলতা, শঠতা বুঝতে দি।

চপলা চারুকে চাপা মেয়ে দেখতে পেয়ে মনে করতে পারল না সহজে কোন কথা বে'র করতে পারবে। বল্‌ল "ঢের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তোমার মত একটীও নজরে পড়েনি, তোমাকে কি কেউ অতিথির যত্ন করতে শেখায় নি?"

এ আঘাত চারু সহ্য করতে পারল না। কি দিয়ে যত্ন করবে সে। তার কি আছে। সেও গৃহিণী হয়েছিল। অনেককে অনেক জিনিষ খাইয়েছে, আর আজ তার কি আছে, বড় দুঃখেই বলে উঠল "আমার কি আছে যে তা দিয়ে তোমায় যত্ন করব? আর যিনি আমায় শিখিয়েছিলেন, তিনি চলে গেছেন। এ পোড়া কপালে কি আর যত্ন করা সাজে!

চারুর কথায় চপলার গোলমাল বাধল। চারুর ওপর তার ধারণা বদলে যেতে লাগল। কিন্তু তাকে ভাল করে দেখে নিতে হবে। বলল—

"তোমার কি না আছে—বোন! রূপই ত মেয়েদের সব। তা তো তোমার ষোল আনাই আছে।"

চারুর মুখ বিরক্তিতে ভরে গেল, চপলা লক্ষ্য করল। এ রূপের কথা শোনাবার জন্য সে ত কাউকে ডাকেনি। অথচ তার মত অসহায় অবস্থায় পড়লে কাতরতা ভিন্ন স্বরে আর কিছু আসে না, বলল—

"আমি ভাই বিধবা, যার জন্যে রূপ—তিনি চলে গেছেন, কেন আর রূপের কথা তুলছ, এ যে এখন আমার কাছে বালাই।"

চপলার মনে কষ্ট হলেও তাকে পরখ করতে হবে, সে না বলে পারল না—"কিন্তু আমি যাঁর কাছ থেকে আসছি তিনি তোমায় বলেন রূপসী।"

অসহায় অবস্থায় পড়েছে বলে আজ সবাই তাকে অপমান করতে চায়। মনে বড়ই ক্ষোভ হল, চোখেও জল পুরে আসতে লাগল।

কাতর ভাবে চপলার দিকে চেয়ে বল্‌ল "তুমি যদি আর কোন কথা না বলতে চাও ত যেতে পার, আমার কাজ আছে।"

চপলাও বলে উঠল "জানবে বড় মানুষের মেয়ে, আমি জমিদার বাড়ীর ক্ষিতীশ বাবুর ঝি।"

ক্ষিতীশবাবুর নামে চারুর চোখ জলে উঠল। আত্মসংবরণ করে চারু ব'লল "যাও, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

চপলা চারুকে চিনতে পারল, মনে চারুর প্রতি শ্রদ্ধা এসে পড়ল, বল্‌ল—

"তবে শোন দিদি, আমি এসেছি ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রী শুভা দিদির গুপ্তচর হয়ে—"

চারু বলল, "কেন, তিনি তোমায় পাঠিয়েছেন ?"

চপলা বলল "দাদাবাবু রূপের পাগল হয়ে দিদিকে পায়ে ঠেলছেন। তাই আমিও দেখতে এলেম কে সে রূপসী! এখন কিন্তু বুঝলুম দাদাবাবু আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছেন, বড় জোর নিজেই পুড়বেন।"

চারুর মনে হল, তা হলে এ ক্ষিতীশবাবুর চর নয়, মনে শান্তি এল। চারিদিকে লোকে যখন শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, তখন একজনের সহানুভূতি পেলেও কতটা শান্তি আসে, কতটা সাহস পাওয়া যায়, তা নিজে না ভোগ করলে বোঝান কঠিন।

"কিসে ও সব বুঝলে"—চারু বলল।

"তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে।" চারুর চখের সামনে যেন সমস্ত ঘটনাটা পরিস্ফুট হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চপলা তরুকে সামনে ডেকে এনে বলল, "একে তোমাদের বাড়ীতে রেখে যাব। সে সব সময় তোমার সহায় থাকবে।

চপলা তরুকে চারুর ওপর নজর রাখতে রেখে যাবে ঠিক করে এসেছিল। কিন্তু আজ তারই বন্ধু করে তারই অসময়ের সহায় করে রেখে গেল।

• এ চরিত্রের প্রভাব—যে প্রভাবে জগাই মাধাই ডাকাতি ছেড়ে

ছিল, ডাকাত রত্নাকর রামায়ণ স্রষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন'। চারুর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

চপলার সঙ্গে কথা বার্ত্তায় চারু, শুভা ও ক্ষিতীশ বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনল। সম্ভ্রমে তরুকে তা'র দরকার নেই জানিয়ে দিল।

চপলা কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে কিছুতেই শুনল না, বলল "ও কাজ কাজ ক'রে হাঁপিয়ে উঠেছিল। আগেকার খোলস বদলেছে, এখানে তাই রেখে যাচ্ছি, খাঁটী হয়ে যাবে।"

তরু দুই এক কথায় জানিয়ে দিল সে কিছুতেই তা'র পাপোর্জ্জিত বাড়ীতে আর ফিরে যাবে না, যখন চারুকে সামনে পেয়েছে ত্যাগ করবে না। তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে চারুকে স্বীকৃত হতে হল।

চারুর একজন সই এসে তার বিপদের পাশে দাঁড়াল।

চপলা চারুর ঘর থেকে বাহির হতেই শৈলজা হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল "কি লো বড়মানুষের ঝি! কেমন আলাপ হল।"

চপলা বল্‌ল "না গো রাশ মানতেই চায় না; প্রথমেত তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।"

চপলা শৈলজাকে জানতে দিতে চায় না, তার আসল উদ্দেশ্য কি। নিজের আসল উদ্দেশ্য লোকে বড় সহজে বলতে রাজি হয় না। হয় ত বা অপরের কাণে গেলে বাধা হতে পারে।

শৈলজাও এই আশঙ্কাই করছিল। চারুকে তিনি হাত

করবেনই—বললেন "আচ্ছা, ওর মন আজ ভাল নেই, দু'চার দিন পরে আবার বেড়াতে এস না ?"

এ ইঙ্গিত চপলা বেশ বুঝতে পারল, বল্‌ল "হাঁ নিশ্চয়ই আসব, তবে এখন এই এ বাড়ীতে চাকরাণী থাকছে, অবশ্য বিনা-মাইনে—দুই একটা কড়া কথা হয়ত ওকে শুনতে হবে।"

শৈলজা চপলার বুদ্ধির প্রশংসা করল। তরুকে আদরের সহিতই জায়গা দিল। চপলাও বিদায় হল।

---

[১৩]

আজ শৈলজা, আদর করে চারুকে নিজের কাছে নিয়ে খেতে বসল। ভাল মাছ আনিয়েছিল—বড়ই আদর করে চোখ মুছতে মুছতে একখানি চারুর পাতে তুলে দিল। চারু শৈলজার মুখের দিকে চেয়ে খাওয়া বন্ধ করল।

শৈলজাও চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল,

“যখন দিয়েছি, খেয়ে নে। আমি বলছি দোষ নেই, ওরূপ বয়সে অত কড়া কড়ি—আমাদের মনে কি হয় বলত ?”

চারু এর কোন উত্তর দিল না। শুধু হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে রইল। শৈলজা শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করল।

“আমারও যেমন বরাত—সব জিনিস সোজাভাবে বুঝতে যাই, সবারই মন ত আর আমার মত সরল নয় !” বলে শৈলজা মুখ ভার করল।

চারুর চোখ তখন জলে পূরে আসছিল। অথচ তা দেখতে পেলে যে কাকিমা কি অনর্থ বাধাবেন, তা সে বেশ জানত। তখনকার তার অবস্থা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের বোঝা কঠিন।

বড় দুঃখের সময়ে হৃদয়ের দুঃখ তাপ, হৃদয়ের কান্না চোখের জলের সহিত গলে বে'র হয়ে যায়।

কিন্তু ভাগ্যদোষে যখন সে উপায়ও থাকে না তখনকার হৃদয়ের

জ্বালা—মনের মধ্যে বৃশ্চিক দংশন সহ্য করা যে কি কষ্ট চারু বুঝতে লাগল।

চারুর মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক হলেও কাকিমার ভীষণ মর্ম্মদায়ক বাক্য আর সে শুনতে চায় না। তা'র ভয় হল সহ্য করতে পারবে না। চারুকেও বলতে হল "আমার আজ ক্ষিদে নাই কাকিমা!"

কাকিমা রাগের সঙ্গেই বললেন, "তোমার যে ক্ষিদে কবে থাকে তা'ত জানি না। অথচ খাওয়া ত বাদ যায় না বাছা, তা লুকিয়ে না খেয়ে সহুরে খেলে কি কিছু দোষ হয়? বিশেষ আমার পাতের বলে যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে।"

চারুর আর সহ্য হচ্চিল না, বলল "যে পোড়া বরাত করেছি কাকিমা, পাতের প্রসাদ খাবার কি আর বরাত আছে!"

"আজকাল বিধবাদের বরাতে যে কি নাই বাছা, তা'ত জানি নে। বিধবারা ত বে করছে শোননি" বলেই রাগের মাথায় উঠে পড়ল। তখন তার খাওয়াও হয়ে গেছল।

* * * *

চারু হাত ধুয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। তরু চোখ মুছতে মুছতে সব দেখল। দুটো পেঁপে নিয়ে চারুর কাছে রেখে দিয়ে বলল, "দিদিমণি কিছু মনে ক'র না, এ দুটো খেয়ে নেও! না খেলে আমি এখানে মাথা খুঁড়ে মরব জানবে।"

চারু এক দৃষ্টে তরুর মুখের পানে চাইল।

এ যে গাঢ় অন্ধকারের পাশে মধুর উজ্জ্বল আলো! পিশাচ হৃদয়ের পাশে দয়ালু হৃদয়ের মধুর সহানুভূতি চারুকে ক্ষণকালের জন্য এক অজানা অচেনা দেশে লয়ে গেল।

চারুকে একদৃষ্টে তার মুখ পানে চুপ করে চেয়ে থাকতে দেখে তরু বল্‌ল, "কি দেখছ দিদিমণি? ছেলেমানুষ তুমি, অনেক দেখতে পাবে। এ হতভাগিনী ঢের দেখেছে। এখানে দেখবে, বেশীর ভাগ মানুষই হৃদয়হীন দয়া-মমতাশূন্য স্বার্থপর—তবু রাগ করে লাভ নেই, আমাদের কাজ করে যেতে হবে।"

তরুর কথায় চারু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌ল—"বেঁচে লাভ কি দিদি বলতে পার? যদি আপনার জনই এরূপ করতে পারে, আমার আশ্রয়ই বা কোথায়?"

তরু বল্‌ল "বাঁচা মরা কি তোমার হাত দিদিমণি। তোমার কেন, সবার আশ্রয় সেই অনাথের নাথ। যতটুকু পারি পরের উপকার করতে হবে। আর চোখ বুজ্‌লে ত সব সম্বন্ধই ঘুচে যাবে। তা'ত হাতেই আছে। ভাবনা কিসের—মন দৃঢ় কর, খেয়ে নেও।"

চারু তরুর হাত এড়াতে পারল না, তাকে খেতেই হল। তা'র সঙ্গে কথা বলেও সে পারল না। গভীর সহানুভূতির কাছে কোন তর্ক খাটে না, কোন যুক্তি টেকে না। সে সবাইকে জয় করে আপনার করে নেয়!

---

[১৭]

শৈলজা বড়ই একগুঁয়ে ছিল। একটি অল্পবয়স্কা বিধবা তারই বাড়ীতে বসে তার কথা অমান্য করতে পারে, এ সে এই প্রথমে চারুর ব্যবহারে জানতে পারল।

কিন্তু কিছু ঠিক করলে ছাড়বার পাত্র শৈলজা ছিল না। চারুকে এর পর থেকে অনেক কথা শুনতে হল।

শৈলজা বিধবার কাপড় সেদিন বাক্সের ভিতর পুরে সধবার উপযুক্ত কাপড় দু'চার খানা বের করে রাখল। চারু বুঝতে পেরে চুপ করে গা ধুয়ে ভিজা গায়ে কাপড় শুখোতে লাগল।

তরু চুপ করে জল-পোরা চোখে দেখল। হাতে পয়সা নাই, কি করবে! আজ সে প্রথম বুঝল, পয়সা দিয়ে কি করতে হয়। তার মনে-হতে লাগল, অনেক পয়সাই নষ্ট করা গেছে!

তরু বিষম বিপদে পড়ল। শৈলজার কাছে সে ক্ষিতীশ বাবুর চর সেজে চপলার অনুরোধে থাকতে পেয়েছে এবং তাতে করেই অসহায়া চারুর সাহায্য করতে পারছে।

এখন কোনরূপে ধরা পড়লে, তার এখানে থাকা ভার হবে। বালিকাকে সহানুভূতি দেখাতে, পার্শ্বে দাঁড়াতে তখন যে কেউ থাকবে না! কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে এ অত্যাচার সে ত আর দেখতে পারছিল না!

জগতে অনেক দেখেছে, অনেক সহ্য করতে পারবার একটা গর্ব্বও মনের ভিতর পুষেছিল। সেই বিশ্বাসে তরু এত বড় একটা কাজ করবার সাহস পেয়েছিল। সে ত জানত না, জগতে নিত্যে কত নূতন জিনিস দেখতে হয়, কত অভাবনীয় অত্যাচারে মন জ্বলে ওঠে—প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা থাকে না, শুধু ছটফট করতে হয়।

তরুর ইচ্ছা হ'ল, ঝগড়া বাধিয়ে দিই—অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারব না, এ হতেই পারে না। কিন্তু তখনই আবার আস্তে আস্তে বুঝতে লাগল, এখনও সময় হয় নি। সুরেন বাবু বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন।

এখন শৈলজাই ত বাড়ীর কর্ত্রী, তা'র বিরুদ্ধে ঝগড়া করবার সময় এখন নয়। মেয়েটা তা হলে আরও বিপদে পড়বে। কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করতে গেলে তাকে সময়ের অপেক্ষায় চুপ করে থাকতে হবে। বিশেষ চপলার অনুমতি ভিন্ন সে কোনও নূতন বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না—সে তারই প্রতিনিধি, তার কাছে কথা দিয়েছে।

কিন্তু চারু ভিজে কাপড় গায় শুখোচ্ছে দেখে, সে মাথা ঠিক রাখতেও পারছে না। তাই ছুটে গিয়ে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি হতে পারে ভেবে বল্‌ল, "দিদিমণি কাপড় চাইছে।"

একটু মুচকি হেসে শৈলজা বল্‌ল, "নূতন কাপড় বাইরে আছে, পরতে বল্‌গে যা। পুরাণ কাপড় দিয়ে সেলাই করা হবে।"

তরুর মনে বড়ই রাগ হ'ল, কিন্তু নিরুপায় হয়ে বল্‌ল, "তা পরবার

জন্য আমি অনেক বলেছি। পরবে না ত কি করব? অত ভাল নয়, বল্‌ল কি না, বিধবার পেড়ে কাপড় পরতে নেই।"

"ও মা, এত ত আগে ভাবি নি" বলেই শৈলজা গালে হাত দিয়া বসে পড়ে বল্‌ল—

"মনে এত মার প্যাঁচ ত বাছা আমার নেই, ছিঁড়ে গেছল তাই সেলাই করবার জন্য তুলে রেখেছিলাম—তা যদি প্রাণে না সয় ত নিয়ে যাও।"

বাস্তবিক কাপড়গুলা এমন ছেঁড়া ও সেলাই করা ছিল যে, তা পরবার অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যার দেবার লোক নেই, যে পরের দেওয়া ভাত কাপড়ের ভিখারী তার আর অন্য উপায় কি আছে!

তরু বল্‌ল "ছেড়া ত সত্যি, কিন্তু আমিত বোঝাতে পারলুম না—কেমন একগুয়ে মেয়ে।"

শৈলজা বল্‌ল "দেখ ত বাছা, কোন্ শাস্ত্রে আছে পেড়ে কাপড় পরলেই সব অশুদ্ধ হয়ে যায়! কিন্তু এর পরে আবার অনেক দেখতে পাবে।"

তরু হেসে বল্‌ল "যাই হোক্, গোঁয়ারতুমি করে অসুখ না করে। বিশেষ বাবু বাড়ী নেই, তোমারই ঘাড়ে শেষে দোষ পড়বে।"

শৈলজা বল্‌ল "সে ত তুমি স্বচক্ষে দেখছ বাছা, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। ওর জন্যে আমার ক্ষিদে তেষ্টা ঘুম নেই, আর আমিই হচ্ছি খারাপ লোক।"

মুখের কথা বড়ই ভীষণ! অত্যাচার, অবিচার—স্বার্থসিদ্ধির এর চেয়ে বড় শাণিত অস্ত্র আছে কি না বলা কঠিন।

যেমন মা ছেলেকে, সাধ্বী স্বামীকে হৃদয়ের পবিত্র ভাব জানাতে এই কথার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন তেমনি আবার গুপ্তশত্রু স্বার্থ-পরায়ণ পিশাচেরাও এই কথার আশ্রয় নিয়ে তাদের গুপ্ত অভিসন্ধির সফলতা কামনা করে।

তরু বল্‌ল, "যেমন বরাত! তবে একদিন তোমায় ও চিনতে পারবে নিশ্চয়। যা হোক্, যে গোঁয়ার, দেও বাছা ছেঁড়া কাপড় বের করে, একদিনে আর কি হবে! নতুবা একটা অনর্থ করে বসবে, আমি ওটা বড় ভয় করি।"

শৈলজার মন নরম হল। তরুর যুক্তির সারবত্তা সে বুঝতে পার্‌ল। একদিনে বেশী বাড়াবাড়ি করলে হয় ত খারাপ ফল হতে পারে।

তার বড় আশা তরুর উপর ছিল। চারুর কাপড় বের করে দিল।

* * * *

তরু কাপড় হাতে করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বুঝতে পারল—কে যেন তার ভিতর থেকে বলে দিল—এ কাপড় কি লোকে পরতে পারে। অমনি কাপড়টা রেখে বলে উঠল "আমি চল্লেম দিদি-মণি, যেরূপে পারি একখানি কাপড় চপলাদির কাছ থেকে নিয়ে তবে আসব।"

চারু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "না ভাই যাসনে! গরিব হলেও আমার পরের দেওয়া কাপড় পরতে নেই। তোর মতন মন যদি সবার হত দিদি!"

তরু বল্‌ল "তবে কি পরবি?"

তরু ভাবের আতিশয্যে 'কাপড় এনে দিচ্ছি' বলে ফেলেছিল। কিন্তু কাপড় এনে দিলে তা যে কত অসঙ্গত দেখাবে এবং চারুর পক্ষ থেকে তা পরবার কোন কৈফিয়তও নেই, পরক্ষণেই বুঝতে পারল। তাই নিরুপায় হয়ে চারুর মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

বিধবার অসহায় অবস্থা আজ তার চোখের সামনে নগ্ন মূর্ত্তিতে বেশ ভাল করে ফুটে উঠল। একজন হারা হয়ে এমনি অসহায় অবস্থায় এরা পড়ে। এর কি কোনই উপায় নেই! উপায় সে করতে চায় কিন্তু মাথায় কিছুই আসছে না। সুধু চারুর মুখপানে চুপ করে চেয়ে রইল।

চারু বলল, "আমার মত অনেক অসহায়া বিধবা আছে। তারা যা পরছে তাই পরব।"

কথাটা তরুর মাথার ভিতর ঢুকল না—বল্‌ল, "তোমার কথা ত ঠিক মাথার ভিতর ঢুকছে না।"

চারু বল্‌ল "কেন শুনিস নি; অনেকে যে এখন নিজে পরের মুখের দিকে চেয়ে না থেকে সুতো কেটে পৈতা করছে, কাপড়ও বোনাচ্চে। তাতেই ত তাদের চলছে।"

চট করে তরুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। এতক্ষণ তার মাথায় এটা ত ছিল না। ঠিক উপায় বের হয়েছে।

"ঠিক বলেছিস বোন! আমি ভেবে তোর কিছু উপায় ঠিক করতে পারছিলাম না। এখন বুঝতে পারছি ধন্য সেই মহাত্মা! সত্যই তাঁ'র প্রাণ গরিবের জন্য কেঁদেছিল নতুবা প্রাণ না কাঁদলে বোন্ এত সহজ উপায় কেউ কখন বে'র করতে পারত না। তরু তার আশার সফলতা দেখবার পূর্ব্বেই তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রণাম করল।

তরু আর দাঁড়াতে পারল না। এখানে যারা চরকা দিচ্ছে সে তাদের চিনত। "আমি চল্লেম তবে" বলে তরু চলে গেল।

নিজের অসহায় অবস্থায় চরকার কথা ভাবতে ভাবতে চারু সজল চোখে ঘরে গেল। সে ভেবে এইটে ঠিক করেছে—নিজের পথ বেছে নিয়েছে।

---

[১৮]

সুরেনের মামাবাড়ী থেকে যাবার জন্য বড় জরুরী তাগাদা এসেছিল। তাদের সবারই অসুখ, না গেলেও ত চলে না। অনেক ভেবে নিয়ে ক্ষিতীশবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্‌ল, "আমার দু'চার দিন দেরি হবে ভাই, একটু নজর রাখবেন। আমার ত আর সহায় সম্পত্তি নেই, আপনারাই বল ভরসা।"

ক্ষিতীশবাবু স্বীকৃত হলেন। এ ভার তাঁর পূর্ব্ব পুরুষ থেকে আনন্দে বয়ে আসছে।

বড়লোক হলে আশ্রিত চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রজাদের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে—এ অতি পুরাতন কাল থেকে চলে আসছে। তাই গ্রামের লোকেরা উহা ন্যায্য দাবির ভিতর ধরে নেয়।

হিন্দু সমাজ পরস্পরের পর নির্ভর করে চলতে শিখিয়ে দেয়। আর যা শেখায় সে সংযম—আজ তার ভিত্তি পাশ্চাত্য আদর্শের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্চে। পুরাতন নিজেকে বুঝি আর ধরে রাখতে পারছে না।

পুরাতন জমিদার বংশের ছেলে হলেও ভাগ্যক্রমে আজ ক্ষিতীশ-বাবু নূতন আলোকে ভরপুর। বাড়ীতে মন টিকছে না। সুরেনের বাড়ীতে আসার আর তার এখন কোন বাধা নেই, কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। তথাপি লজ্জা করতে লাগল। এর কারণ

ক্ষিতীশবাবুর মনই জানে। নিজের মন নিয়েই লোকে সদাই শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

শৈলজা খবর দিল, তাঁরও বালির বাঁধ ভেঙে গেল। মনের কাছে নিমন্ত্রণ রক্ষার ছুতো করে ক্ষিতীশবাবু এসে হাজির হলেন।

শৈলজা এখন ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে। যথারীতি সাদর সম্ভাষণে অতিথির পদোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

পুরুষলোক মেয়েদের কাছে খুব সহজে ধরা পড়ে যদি সে মেয়েদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলাপ করতে পারে, দু'চার কথার পর চারুর কথা উঠতেই ক্ষিতীশবাবু নির্লজ্জের মত বলে উঠলেন "যদি একবার তাকে ভাল করে দেখতে পারি তা হলে আশা করি ওর একটা উপায় করতে পারব।"

শৈলজা বল্‌ল, "ঠাকুরপো চারুর একটা কিছু উপায় করবার দরকার হয়েছে, মানুষের শরীর, আমাদের কথা ত বলা যায় না, বয়স ত কম হল না।"

ক্ষিতীশবাবু বললেন "ওকথা ব'ল না বৌদি, তবে আমার দ্বারা যদি কোন উপকার সম্ভব হয় বিশ্বাস কর বৌদি তা নিশ্চয় হবে।"

শৈলজা আর কোন্ কিছু শুনতে চাইল না। তা'র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে যে বড় বেশী দেরি নাই সে বিষয়ে সে ঠিক করল।

"আসছি ঠাকুরপো, একটু বসো" বলে চারুকে ডেকে আনতে শৈল উঠল।

* * * * *

চারু তখন চরকার কথা ভাবতে ভাবতে হৃদয়ে তন্ময়তা এনে-ছিল। অসহায় বিধবার মনে আত্মনির্ভরতার দৃঢ় সঙ্কল্প জেগে উঠেছিল, আর শত কোটী প্রণাম করছিল তাঁকে যিনি এমন সহজ উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

শৈলজা এসে ডাকল, "চারু, বাইরে আয় ত।"

চারু বাইরে এল।

"ক্ষিতীশবাবু একলা বসে আছেন একটু বসগে, আমি আসছি।" বলে শৈলজা বড়ই কঠোর আজ্ঞা আজ চারুর পর করল।

সেদিন চারু চপলার মুখে সমস্ত শুনেছে। সে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে ক্ষিতীশবাবুর এখানকার লক্ষ্য কি? তিনি নিজেও ত ভালবাসার কথা তুলেছিলেন। এর পর, বিধবা কিরূপে তারই সামনে গিয়ে মুখ উঁচু করে দাঁড়াবে। লজ্জাহীনা হয়ে তাকে আপনার ভেবে দুটা কথা বলবে। স্বামীর মর্য্যাদা ও নিজের ভবিষ্যৎ চারুকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করে তুলল।

চারুর পা চল্‌ল না। মনেও আজ তার কাকিমার সামনে উত্তর দিতে প্রবৃত্তি ছিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শৈলজা চারুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্‌ল, "আমার কথাটা শুনতে পাওনি। একবার যাও বাছা, ক্ষিতীশবাবু একলা বসে আছেন, আমি আসছি।" চারু তথাপি নীরব নিশ্চল।

শৈলজা রেগে উঠে বল্‌ল, "যাবে কিনা বল, যদি আমার কথা না শুন্‌তে চাও ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।"

চারু কেঁদে বল্‌ল, "আমি কোথায় যাব কাকি মা? তোমার পায়ে ধরি বেরিয়ে যেতে ব'ল না।"

শৈলজা দৃঢ়স্বরে বল্‌ল, "হয় কথা শোন, নতুবা বেরিয়ে যাও; আমি অন্য কথা শুন্‌তে চাই না।"

চারু জান্‌ত শৈলজার হুকুম অমান্য হবে না। কাকাও ত বাড়ীতে নেই। কাকে সে দুঃখের কথা জানাবে? তথাপি বল্‌ল, "ওর সামনে কাকি মা যেতে পারব না—উনি যেরূপ ভাবে চান!"

শৈলজা রাগে মুখ ভেঙিয়ে বলে উঠল "কেন তুমি কি কচি খুকি নাকি যে কিছু বোঝ না! উনিত বাঘ ভাল্লুক নন যে খেয়ে ফেলবেন!"

চারুর স্বর দৃঢ় হল, বল্‌ল, "বিধবা আমি—ওর সামনে যেয়ে ওর কথা শুন্‌তে পারব না।" চারুর ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক হল।

শৈলজা রেগে উঠে বল্‌ল, "তবে আমার বাড়ী থেকে এখনই বের হতে হবে। জমিদার প্রতিপালকের নিন্দা আমার সামনে দাঁড়িয়ে হবে না বাছা, ভাগ্যি এখানে এখন কেউ নেই, শুন্‌লে কি ভাবত? ওমা, একটু লজ্জাও করল না।"

চারু সজল চোখে চুপ করে শুনতে লাগল। রাগের মাথায় শৈলজা বলতে লাগল, "জমিদারের সামনে দাঁড়াতে আজ লজ্জা হচ্চে, কিন্তু এখনই যে সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বাছা, আমার কথা না শুনলে জায়গা দিতে পারব না।"

চারু আর শুনতে পারল না, ছুটে গিয়ে পাগলের মত নিজের ঘরে ঢুকল।

কি করবে এখন সে—কোথায় দাঁড়াবে? মনে মনে বল্‌ল, ‘ব’লে দাও স্বামী, তোমার সাধের চারু—তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার দেখিয়ে দেওয়া জায়গা আজ হারাচ্ছে, এখন সে কোথায় যাবে? এ মুখত কখন কারুর সামনে তুমি বার করতে দাওনি। বড় যত্নে বড় আদরে রেখেছিলে। আর আজ আমার দশা—’

চোখ ভরে জল আসতে লাগল, চারু ক্ষণিকের তরে সংজ্ঞা হারাল। কিন্তু যে কালসাপিনীর বিবরে সে প্রবেশ করেছে, সে ত তাকে ছাড়বে না।

শৈলজা চারুর দেরী দেখে তার ঘরে ঢুকে দেখল, চুপ করে বসে আছে; বল্‌ল, “আমি ভাবলুম, তুমি কাপড় ছেড়ে ভাল কাপড় পরতে এসেছ। এখন দেখছি, আমার কথা কানে যায় নি। তবে চল বাছা, এ বাড়ীতে যায়গা হবে না।”

চারু এখন কি করবে—বাইরে জগতের সামনে খোলা মুখ নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তবে তাই হোক।

মেয়েদের কাছে স্বামী ভিন্ন সবাই ছেলে মেয়ে। যত্ন সেবা শুশ্রূষা করতেই ত’ তাদের জন্ম। যে প্রেমময় স্বামীর সোহাগে আহ্লাদে সে নিজেকে ভুলবে, প্রেমে গলে গিয়ে যার সঙ্গে সে মিশে যাবে, যার কাজে সে আবদ্ধ, যার সংসারে সে জড়িত এবং যাঁর আদেশে তাকে উঠতে বসতে হবে; তাঁকে হারিয়ে যে সে সব হারিয়েছে।

• একজনকে হারিয়ে যে জগতের কাছে ব্রহ্মচারিণী বেশে সব

বিধবারই জীবন উৎসর্গ করে দিতে হয়। জগৎপতির সব সন্তানেরই দুঃখ মোচন সেবা-শুশ্রূষা করাই তখন তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত হয়—তাতেই তাঁদের নিকট মৃত অশরীরী পতির স্মৃতির পূজা। সেই স্মৃতিপূজা সে আজ করবে।

ঘরের কোণে বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করছিল; আজ অবস্থার কষাঘাতে সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। মন দৃঢ় করতে লাগল। কিন্তু কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার আর এক মুহূর্ত্তও বাড়ীতে থাক্‌বার প্রবৃত্তি রইল না। কোথাই বা যাবে? অস্থির মনে ভাবল এ অবস্থা থেকে ত এখন উদ্ধার পাওয়া যাক। ছেলেমেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াই—দেখি মায়ের দুঃখে ছেলের প্রাণ কাঁদে কি না।

একটা অবস্থায় পড়ে লোকে যখন উপর্য্যুপরি বিপদগ্রস্ত হয়, বড়ই ছটপটিয়ে পড়ে কোন কিছু না ভেবেই সামনে যা পায় তাই আগ্‌লে ধরে। একবারও চিন্তা করে দেখে না কোথা থেকে কোথায় যাচ্চি।

বাইরে যেতে পা বাড়াতে চারুর মনে পড়ল—ক্ষিতীশবাবুকে তার কিসের ভয়! মেয়েলোক হলেও সে কি এতই হীন।—এতই নরম যে নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারবে না। যাহোক তাঁরই কাছেই আশ্রয় চাবে, পাবেও নিশ্চয় জমিদার তিনি, তা'র পর বেশী দাবী আছে।"

এই ভেবেই চারু ক্ষিতীশবাবুর সামনে এমনি ভাবে এল, যে ক্ষিতীশবাবু আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারলেন না। ক্ষিতীশবাবুর সে ভাব না কাটতেই চারু বলে উঠল, "আমায় আশ্রয় দেবেন? আমি অনাথিনী।"

আর কোন কথা চারুর মুখ দিয়ে বের হল না। চোখের জলে গণ্ড ভেসে গেলে। চারু নিজেকে ঢাকৃতে মুখ ফিরাল। কিন্তু ক্ষিতীশবাবুর তখন উন্মাদের মত অবস্থা—বলে উঠলেন, "তোমায় নিশ্চয় আশ্রয় দেব। না, মার কাছে একবার শুনতে দেও—একটু দাঁড়াও।" বলে ক্ষিতীশবাবু বাইরে যেতে সামনে শৈলজাকে পেয়ে বলে গেলেন "আমি এখনই আসছি।"

শৈলজা নিজের মতন বুঝে নিয়ে চারুর হাত ধরতেই চারু টপ করে বসে বল্‌ল, "হাত ছাড়ুন, আমি কি করছি!" বলে জোরে কেঁদে উঠল।

কিসে কি হল শৈলজা বুঝতে পারল না। যার যেমন মন, যেমন শিক্ষা সে সেইরূপ ঘটনাই বুঝতে পারে, মনের সঙ্গে মিল রেখে মানে করতে যায়। অন্যরূপ দেখলেই গোলমালে পড়ে বুঝতে পারে না।

চারুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বল্‌ল, "তোর ভালর জন্যই বলি বাছা, কাঁচা বয়স বুঝতে পারছ না—আমাদের বয়স ঢের বেশী। আমার কথা শুনলে পরিণামে ভাল হবে।"

চারুর কিছু শুনতে ইচ্ছা করছিল না, বলল, "তোমার পায় পড়ি কাকিমা, আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে—আমায় আর কিছুই বল না, সইতে পারছি না।"

কাকিমা রেগে বল্‌ল, "কি এমন বলেছি বাছা, যে আমায় এত কথা শুনাচ্ছ। তোমার ভালর জন্যেই বলি, না শোনত আমি যাই।" কাকিমা চারুকে রেখে রেগে বেরিয়ে গেল।

---

[১৯]

কংগ্রেস অফিসে যারা তূলা ও চরকা দিচ্ছিল তরু তাদের কাছে এসে হাজির হল।

কিন্তু দাম না দিয়ে কোন বিশ্বাসে তাদের নিকট পাবার আশা করে? ভাবল ফিরে যাই, চপলাদি'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসি গে।

কিছু ঠিক করতে না পেরে যখন সে অফিসের সামনে ঘুরছিল দেখল সখিচরণ এক মোট তূলা ও চরকা ঘাড়ে করে দুপুর রৌদ্রে গলদঘর্ম্ম দেহে আসছে। বড়ই মধুর দৃষ্টি তরুর চোখে পড়ল। অতীতের কথা, অতীতের রাগ অভিমান সে ভুলে গেল। এমন সময় সখিচরণও তাকে দেখতে পেয়ে একদম সামনে এসে বল্‌ল, "কি চাও বাছা—"

কিন্তু মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে আশ্চর্য্য হল। বুঝতে পারল না কি জন্যে তরু এখানে এসেছে, তাকে ফিরিয়ে নিতে কি! না, সেত যাবে না—যে কাজে আজ সখিচরণ গা ঢেলে দিয়েছে, শান্তি পেয়েছে তাকে আর সে ছাড়তে পারবে না।

তার মত অনেকেই ত আজ অতীত জীবন ভুলে দেশের কাজে মাথায় মোট বয়ে বেড়াচ্চে। আর সে চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকবে না।

তরুকে বল্‌ল, "কি জন্য এসেছ, আমায় ফিরিয়ে নিতে? না, আমি যাব না। আমি দেশের কাজ ছেড়ে যাব না।"

সরলচিত্ত লোক যখন একটা কাজ ভাল বুঝে করতে আরম্ভ করে তার জন্যে জীবন দিতে পারে। শিক্ষিতের কূট স্বার্থপর নীতি দ্বারা সে চালিত হতে চায় না। তাই দুই স্তরের লোক পরস্পরকে বুঝতে পারে না।

তরুর সখিচরণের পর রাগ অভিমান পড়ে গেল—যে আজ পরের জন্য এত খাটছে তা'র পর মেয়েরা রাগ রাখতে পারে না, সে তাদের হৃদয়ের বড় কাছে এসে যায়।

তরু বল্‌ল, "না তোকে নিতে আসিনি। তুই আমাকে সেদিন ও অবস্থায় ফেলে আসতে পারলি!"

সখিচরণ বল্‌ল, "রাগের মাথায় রামচরণকে ঢেকির বাড়ি মেরে ভাবলাম বুঝি ও মরে গেল। তাই পালিয়ে পালিয়ে ছিলাম। সে বেঁচেছে দেখে আজ বাবুদের প্রসাদে এই কাজ করে বেড়াচ্ছি। আর ঘরে যাবনা রে—তুই ফিরে যা, নয়ত এই কাজ কর। মেয়েদের ভিতর উপকার করতে পারবি। আমি ত তা সুবিধা মত পারছি না। তোর মত এক জনের দরকার আছে রে।"

তরুর মনের ভিতর সখিচরণের কথাগুলি আঘাত করছিল। তার বড়ই হিংসা হল সখিচরণ আজ তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করতে পারছে—করুক, ভালই ত—সে চপলাদি'র কথা মত চারুর বিপদে তার পাশে দাঁড়াবে।

কিন্তু সখিচরণ তার জন্যেই পলাতক জানবার পর, আর সে তার সামনে থাকতে চায় না—বল্‌ল, "পয়সা কাছে নেই, তুই যদি পারিস বাবুদের বলে আমাকে একটা চরকা ও কিছু তূলো দে। সূতো কেটে দাম শোধ দেব—শোধ হলে আর একটাও নিয়ে যাব."

সখিচরণ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বাবুদের বলে তাকে হু'টা চরকা ও তূলা দিয়ে বল্‌ল, "তুইত দেখছি আর এক নূতন জীবন পেয়েছিস।"

সখিচরণ শান্তির নিশ্বাস ছাড়ল। বাস্তবিক তরুর জন্য তার মনে মাঝে মাঝে কে যেন বলে দিত তার কাছে একবার শুনে এসেছিস্, তাকে কার হাতে অসময়ে সঁপে দিয়ে এলি?

তরু তূলা ও চরকা নিয়ে আসবার সময় সখিচরণকে প্রণাম করে বল্‌ল, "তোর কাজে তুই থাক, আমার কাজে আমি যাই। কাজ ছাড়িস না যেন।"

সখিচরণ কথা না বলে চুপ করে রইল।

---

[২০]

ক্ষিতীশবাবু গিয়ে মাকে প্রণাম করতেই মা ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাস্ বল ত।"

তিনি ছেলের প্রকৃতি ছোট কাল থেকে জানেন। যে স্বভাব নিয়ে আমরা গড়ে উঠি সে কেবল একমাত্র মা'ই সুচারুরূপে দেখতে পান। পরিণত বয়সে স্বভাবের সে ধারা একটু দৃঢ়ীভূত হয়। ছেলের ভাবে মা বুঝতে পেরেছিলেন ছেলে কিছু আবদার করতে এসেছে, তাই মনে বড়ই আহ্লাদ হল। এরূপ আবদার আজকাল ছেলে করে না বলেই ত তার মনে দুঃখ হচ্ছিল।

কিন্তু ছেলে বলে উঠল, "মা, আর একটী মেয়েকে এখানে আশ্রয় দেবে?"

মার মনে গোলমাল ঠেকল। কিছুই ভাল করে বুঝতে পারলেন না—ছেলে কি বলতে চায়। ছেলের সলজ্জ ভাবে ও কথায় যা বুঝতে পারা যায় সে এতই অসঙ্গত ও চিন্তার অতীত যে মায়ের মনে স্থান পাচ্ছে না।

মনের ভিতর যা আসে তা সুধু অকপটে বলে যেতে পারে যারা পাগল। কিন্তু স্ত্রী পুত্র পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী ও সমাজ শুদ্ধ লোক নিয়ে যে জীবকে বাস করতে হয় প্রকৃতিস্থ থাকলে তার মনের ভিতর

অনেক ভাব উঠেই সেথায় বিলীন হয়। মনের অনন্ত আশা কেউ সফল করতে পারে না এবং প্রকৃতিস্থ থাকলে কেই বা তা লোকের কাছে বলে হাস্যাস্পদ হতে যায়।

কিন্তু ক্ষিতীশবাবু আজ রূপের নেশায় পাগল হয়েছেন। এখন তিনি যা কিছু ভাবতে পারেন তাই বলতে পারেন। বিশেষ মায়ের কাছে ছেলে কবেই বা নিজেকে চাপতে চায়—পারেও না। যার কোলে বসে ছেলে প্রথম আধ আধ কথা বলতে শেখে, যার হাতে ধরে আছড়ে খেতে খেতে উঠে দাঁড়ায় তার কাছে ছেলের মনের ভাব কতক্ষণ চাপা থাকে?

দুই এক কথায় ক্ষিতীশের মনের ভাব মা'র নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখনই তিনি রেগে বলে উঠলেন—

"ক্ষিতীশ, যতই আমি আদর দি না কেন, তুই মনে রাখিস নলিনী বাবুর বোনকে বে' করেছিস। সে আমার গৃহলক্ষ্মী। তা'র পার কাছেও আর কারো স্থান হবে না বলে দিচ্ছি।"

মা বিরক্তিভরে স্থান ত্যাগ করলেন। ক্ষিতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * * *

মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে চপলা বলে উঠল, "মা কি হয়েছে?

রাগের মাথায় মা বলে উঠলেন, "শুনেছ বাছা ছেলের কথা! উনি কোথায় কাকে পছন্দ করেছেন—আবার বে' করতে চান!"

এই বলেই পাশে শুভাকে দেখতে পেয়ে চুপ করলেন। বড়ই

লজ্জা পেয়ে মা বউকে কোলের কাঁছে টেনে নিয়ে কত আদর করতে লাগলেন।

কথাটা চপলা শুনতে পেয়েই বলে উঠল—"মা, তুমি অনুমতি দেও না কেন? দিদিমণি সব সহ্য করতে পারবে।" চপলা ভাবল আমিত জানি সে মেয়ে কি দিয়ে গড়া। শত দাদা বাবুর চেষ্টায়ও সে ভুলবে না।

বড় ক্ষোভের সঙ্গে মা বললেন, "বৌমা আমার কত সাধের বৌ—তা ত তুই জানিস্।"

মায়ের চাহনি চপলা সহ্য করতে পারল না। সামনে থেকে সরে গেল।

* * * * *

মায়ের কথায় চপলা বুঝতে পারল দাদাবাবুর মাথা খারাপ হবার আর দেরি নেই। এবার তাকে ফিরতে হবে। এই সময়ের জন্ম চপলা অপেক্ষা করছিল। প্রবৃত্তিকে জোর করে ফেরাতে গেলে অনর্থ ঘটতে পারে ভয়ে এতদিন সে চুপ করে ছিল। ক্ষিতীশ বাবু স্বাধীন যুবক, তার মনের কথা এতদিন সে ঠিক জানতে পেরেও প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু বুঝতে পারল তাকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হবেহ। এতটা বিশ্বাস তার চাকর পর হয়েছিল। কিন্তু যদি বোন এ সময়ে অভিমান করে বসে তা হলেই সব গোলমাল হয়ে পড়তে পারে। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যতই মধুর হোক, এই অবিশ্বাসের লজ্জা অভিমান

কাটিয়ে ওঠা যায় না—অনর্থ ঘটায়। অনেক সময় সে ভুল শোধরাবার সুবিধা শেষ পর্য্যন্তও মেলে না। এই ভাবনাই এখন চপলাকে নিপীড়িত করতে লাগল। তাই শুভার কাছে ছুটল।

চপলাকে দেখতে পেয়ে শুভা বলে উঠল, "ব্যাপারটা কি বলত।"

শুভার মুখ গভীর চিন্তামগ্ন। চপলা শুভার মুখের দিকে চেয়েই হেসে ফেলল।

শুভা রাগের মাথায় বলল, "তোর সব কাজেই হাসি।"

"কেন হাসব না? তুমিত বরের ভাগ আমায় দিতেই চেয়েছিল। আমি যদি অপরকে দি?"

শুভা বলে উঠল, "বরের ভাগ কি অত সহজে যাকে তাকে দেওয়া যায়!"

চপলা আর নিজেকে চাপতে পারল না, বলল, "কাউকে দিতে হবে না। দাদাবাবুর বুদ্ধি দেখে হাসি পাচ্ছে।"

"কোথায় হাসবার মত দেখছিস?"

"কেন দেখব না? দাদা বাবু তোমায় ষোল আনা ভালবাসে।"

"কিসে বুঝলি পোড়ারমুখি?"

"আমি ঠিক বুঝেছি। যদি বুঝতাম দাদাবাবু তোকে গ্রাহ্যই করে না, তুই থাকলেও যা না থাকলেও তা, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার, তা'হলে ভয় হত। এদিকে সংসারে ষোল আনা মিশবার ইচ্ছাও আছে। আমি বলছি, সব বদলে যাবে। তোর কাছে দাদাবাবুকে লুটাতে হবে, দুদিন আগে আর পরে।" বলে চপলা হাসতে লাগল।

শুভা চুপ করে শুনল, তার আর এত কথা শুনবার প্রবৃত্তি ছিল না।

চপলা বলল, "সত্যি বোন, যে পুরুষগুলো নির্ব্বিকার, মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায় না, তাদের বশ করা বড়ই কষ্টকর, কিন্তু যারা রূপের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, তাদের বশ করা বড়ই সহজ। একটু সহানুভূতি পেলেই তারা সেবক হয়ে পড়ে জানবি।"

চপলার বলবার ধরণে শুভার মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল। সে বল্ল, "এদিকে যে সহানুভূতি কেউ চায় না, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না?"

"খুবই চায় রে, তবে ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা এখনও হয়নি। মাত্র দুদিনেই দেখবি দাদাবাবু এই রত্নের আদর করতে ষোল আনা শিখবে। তখন আমাদের সঙ্গে কথা বলবারই সময় পাবি নে।"

"যা, তোর রঙ্গ রাখ।" বলে শুভা চলে যাচ্ছিল। চপলা তার কাপড়ের আচল টেনে ধরল। এখনও যে তার আসল কথাটা বলা হয় নি। বল্ল —

"তবে একটি কথা বলি বোন, দেখিস যেন দাদাবাবুর পর অভিমান করে বসিস নি; ওদের দোষ আমরা ঢেকে না নিলে কে নেবে বলত? মনের টান আস্তে আস্তে আসবেই, তবে তার সুবিধা দেওয়া দরকার। এইটুকুই মনে রাখিস বোন, দিদি হয়ে আজ এই অনুরোধ করচি, বল রাখবি?"

"আচ্ছা, দেখা যাবে" বলে শুভা পালাতে গেল।

চপলা জানত শুভাও জমিদারের বোন। তাই মনে বড় ভয় হতে লাগল, হাত ধরে আবার বলল, "বল আমার কথা রাখবি।"

"আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে" বলে শুভা জোর করে পালিয়ে গেল।

[২১]

ক্ষিতীশবাবু দাঁড়িয়ে থেকে বুঝলেন, মার মত সহজে পাওয়া যাবে না। যদিওবা মা শেষে মত দিতে বাধ্য হন ত দু এক দিনে দেবেন না নিশ্চিত, আপাততঃ ওকে সুরেন বাবুর বাড়ীতেই তবে রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি সুরেন বাবুর বাড়ীর অভিমুখে ছুটলেন। তিনি যে তাকে 'এই আসছি' বলে চলে এসেছেন।

চারুর আশ্রয় চাবার পর থেকে ক্ষিতীশবাবুর মাথার ঠিক ছিল না,—থাকতে পারে না। তার আরাধ্য বস্তু, তার সাধনার ধন নিজে এসে আজ তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। তার চোখে যে তিনি আসবার সময় জল দেখে এসেছেন।

তাড়াতাড়ি সুরেনবাবুর বাড়ীতে ঢুকতেই শৈলজা সামনে পড়ল। ক্ষিতীশ বললেন, "আপাততঃ আপনি ওকে এখানেই রাখুন, আমি খরচপত্র দিব।"

শৈলজার কামনা কেমন করে এত সহজে সফল হয়ে যাচ্চে, সে বুঝতেই পারল না। অমন গোঁয়ার গোবিন্দ ছুঁড়িটা কোন্ যাদুমন্ত্র বলে এত সহজে ক্ষিতীশবাবুর বশ মানল, তাও সে ভেবে ঠিক করতে পারল না। তথাপি বলল—

"আমরা আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের অন্নেই প্রতিপালিত ক্ষিতীশবাবু! যদি ওর একটা গতি আপনার দ্বারা হয়ে যায় ত তার

চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে? তবে উনি এখন এখানে নেই!"

মনের কোন নিভৃত কোণে শৈলজার আজ আঘাত করতে লাগল—"কাজটা ঠিক হচ্চে কি, লোকে নিন্দা করবে না ত! যাই হোক, উনি আসুন, ভাল করে পরামর্শ করে করা যাবে।"

তাই আজ শৈলজা শেষ মুহূর্ত্তে বিবেকের কশাঘাতে সময় নেবার জন্য, মনের নিশ্বাস ফেলবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হল।

ক্ষিতীশ বাবু বলে উঠলেন, "আপনার ত অমত নেই?"

শৈলজা কিছু ঠিক করে উঠতে না পেরে বল্‌ল, "না, আপনার কাজে আমার অমত হবে!"

ক্ষিতীশবাবু অমনি দুখানা নোট দিয়ে শৈলজাকে প্রণাম করলেন।

নোট দুখানার দিকে তাকিয়ে শৈলজার হাত উঠল না যে তোলে।

কিন্তু এখন না নিলেও যে কত বড় অপমান করা হবে বুঝতে পেরে নোট নিয়ে সরে গেল। ক্ষণিকের জন্য মনের গোলমালে মুখের কথা সব সরল না।

* * * *

ক্ষিতীশবাবু আজ আর বাইরের ঘরে বসলেন না, যে অনাত্মীয়তার পর্দায় বাঙ্গালীর ভিতর বাহির পৃথক করে রাখে আজ তিনি বুঝি সেটা পার হলেন।

একেবারে চারুর সামনে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,

"কিছুদিনের জন্য এখানে থাকতে হবে, তারপর বাড়ীতে যাওয়া যাবে।"

একথার মানে চারু বুঝ্তে পারল না। বাড়ীর ভিতর এসে একলা তা'কে একথা বলা কিরূপে সম্ভব হচ্চে! চারু চুপ করে আছে দেখে ক্ষিতীশ বাবু বলে উঠলেন—

"বিয়ের বন্দোবস্ত সুরেনবাবু এলেই হবে। আমি বৌদিকে বলেছি।"

চারুর গোলমাল বাড়তে লাগল—'কি বলছেন ইনি, কার সঙ্গে বে।' কথা না বলে চারু পারল না, বলল, "কার বের কথা বলছেন আপনি?"

"কেন তোমার আমার?" বলে ক্ষিতীশ বাবু চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চারুর চোখের সামনে থেকে পৃথিবী সরে যেতে লাগল। একজন পরপুরুষ স্বামিত্বের দাবিতে বুভুক্ষুর চোখ নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

অতি কষ্টে বল্ল, "বাবু, আমি বিধবা!"

ক্ষিতীশ বাবু চমকে উঠলেন কিন্তু একে ছাড়লে যে তার জীবন বৃথায় যাবে। একটু সামলে "বললেন, হও বিধবা, আমি বিধবা বে' করে সমাজের সামনে উন্নত মস্তকে দাঁড়াব, শাস্তি পাই মাথা পেতে নেব। ভালবাসার বাঁধন সব চেয়ে বড় বাঁধন—কোন বাধা মানে না। তোমা বিনে আমার আজ সব অন্ধকার।"

চারুর সহ্য হচ্চিল না, বল্‌ল, "না, আমার স্বামী আপনার চোখে মৃত হলেও আমার কাছে সব সময় বুকের ভিতর জেগে রয়েছেন। আমায় ওকথা শোনাবেন না।"

ক্ষিতীশবাবু বেড়া ধরে দাঁড়ালেন। এতদিন তিনি যে আশাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এত বড় করেছেন সে আজ মরুভূমিতে মরীচিকা হল। অত সহজে আশা তিনি ছাড়তে পারেন না—বললেন, "বৌদির মত করতে পারব। বৃথা জীবন বয়ে লাভ! যে তোমার জন্যে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করছে, তার পানে চাও। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহে আপত্তি কর না।"

চারু বলে উঠল, "আমায় ও কথা আর শোনাবেন না।"

ক্ষিতীশবাবু বললেন, "না শুনিয়ে পারছি না বলেই শোনাচ্ছি, আমায় মাপ কর।"

চারু কাতর ভাবে বল্‌ল, "আমি দীনা বিধবা আশ্রয়হীনা, আপনায় আমি কি মাপ করব?"

তবুও ক্ষিতীশবাবু কাতর ভাবে বললেন, "ওগো আমি বড়ই কাঙাল।"

চারু বল্‌ল, "আমি আপনার সব শুনেছি, সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীকে অনাদর করবেন না। যে দিন দেখব আপনার স্ত্রীকে আপনি আদর করছেন, আমরাও আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করব।"

যখন আমরা বর-বধূ সেজে বসি, তখন বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব আমাদের মাথায় থাকে না। বে'র পরও তা বুঝতে কিছু দিন কেটে

যায়। সেই কয়দিন রঙ্গিন্ নেশায় সময় কাটতে থাকে। অথবা মান অভিমান কলহ করেই সময় যায়—ইহাও পরস্পর অজানা প্রাণের মিলিবার পূর্ব্বলক্ষণ। ঠিক বুঝতে না পেরে এ সময়ে ক্ষিতীশবাবু গোল বাধিয়েছেন।

চারুর কথায় তার মনে আজ ঝড় তুলে দিল। কিছুই বুঝতে না পেরে মুখ দিয়ে শুধু "আচ্ছা" এই কথাটা বেরুল। এখন তার স্ত্রীকে বুঝবার জন্য তার নিকট চারুই হচ্চে আদর্শ।

চারুও আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "যে দিন দেখব স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সমাজের একজন হয়ে দাঁড়ালেন, সেই দিন সমাজের দাবি নিয়ে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য আমরা যাব।"

ক্ষিতীশবাবুর মনে অনেক কথা পড়তে লাগল। বিবেক নিজেকে প্রকাশ করবার সুবিধা খুঁজছিল। আজ সে সুবিধা ক্ষিতীশ বাবুর ভাগ্যগুণে শীঘ্র মিলে গেল।

সমাজ সংস্কারের কথায় ক্ষিতীশবাবুর মনে আজ তার সাধ্বী স্ত্রী শুভা এক নূতন আলো নিয়ে জ্বলে উঠতে লাগল। তাকে নবীন যুবা বোধ করতে না পেরে চারুর সুন্দর মুখ পানে বড় কাতর ভাবে চাইলেন।

চারু তার মুখপানে সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌ল, "নিজের জনকে একদিন চিনবেনই।"

আর সে সামনে থাকল না, সরে গেল। ক্ষিতীশবাবুর মন তখন চারুর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল।

চারুর সতেজ দৃষ্টি সবল উত্তর আজ ক্ষিতীশবাবুর প্রেমোন্মাদ দুর্ব্বল মনকে জয় করে নিল।

বিভ্রান্ত মন নিয়ে পাগলের মত ক্ষিতীশবাবু উঠলেন। প্রপাত পতনের মুখে ভাগ্যগুণে আজ বড়ই ধাক্কা খেলেন। কত সামান্য কারণে খেলাচ্ছলেও যে মানুষ পতনের পথে সত্বর অগ্রসর হয়, নিজের সংসার, দেহ, জীবন ছারেখারে দেয় আজ অভ্যাসচ্ছলে মনের ভিতর তিনি তা বুঝতে পারলেন।

আর বুঝতে পারলেন পুরুষ মানুষ হয়ে, শিক্ষিত জমিদার হয়ে, সাধ্বীর পতি হয়ে তিনি গিয়েছিলেন এক বালিকার কাছে নিজের প্রেম জানাতে! লজ্জা হতে লাগল। কত বড় মন নিয়ে কত জোরের সহিত বালিকা তাকে আজ প্রত্যাখ্যান করল। তা'র স্বামীকে সে কত ভালবাসতে শিখেছে—তিনি আজ বহুদূরে থাকলেও সে ভুলতে পারছে না, তাকেই আঁকড়ে ধরছে। আর পুরুষ মানুষ তিনি নিজের স্ত্রীকে সামান্য দোষে ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। ফিরে গেলেন।

হায়! সবাই যদি এরূপে ফিরবার ভাগ্য পেত!